সোনার পিতল মূর্তি

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

পূর্ণ প্রকাশন
৮এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীরথীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
৮এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : নববর্ষ, ১৩৬৮

মুদ্রণে :
শম্ভুনাথ মাইতি, নারায়ণচন্দ্র পাল
নিউ বাণী মুদ্রণ
৩৮, শিবনারায়ণ দাস লেন
কলিকাতা-৬

উৎসর্গ

চিরঞ্জীব সেন

সুচরিতেষু

॥ এই লেখকের আরো রহস্য উপন্যাস ॥

অন্ধত্রাস

ছায়া পড়ে

বিমূর্ত পাপ

হাঙর

মা নিষাদ

প্রথম পর্ব ঃ সোনার পিতল মূর্তি

এক

বিজনের বিবৃতি

আনন্দ একদিন এসে বলল—আচ্ছা বল্ তো, প্রেমে পড়লে তবে লোকে গাড়োল হয়, নাকি শুধু গাড়োলরাই প্রেম করে ?

অবাক হয়ে বললুম—হঠাৎ এ কথা কেন রে ?

সে হতাশভাবে মাথা নাড়ল। তারপর বলল—আমার বসকে খুব বুদ্ধিমান মনে করতুম। ইন দা সেন্স—বুদ্ধিমান ছাড়া কেউ পয়সা কামাতে পারে না এ যুগে। কিন্তু আশ্চর্য, কিছুদিন থেকে লোকটার ব্যাপার-স্যাপার দেখে আমার চক্ষু ছানাবড়া হয়ে যাচ্ছে !

বাধা দিয়ে বললুম—প্রেমে পড়েছেন বুঝি ভদ্রলোক ?

—প্রেম মানে কী ! প্রেমেরও বাবা-মা থাকলে তাদের পাল্লায় পড়েছে। বাপ্‌স !

আনন্দ একটু বাড়াবাড়ি সব ব্যাপারেই করে। ওর কথায় গুরুত্ব কখনও দিইনে। তাছাড়া ওর বসকে আমি চিনি। রীতিমতো ঝানু ব্যবসায়-বুদ্ধির মানুষ। চৌরঙ্গী এলাকার একটা বাড়ির চারতলায় আমাদের পারুল এ্যাডভার্টাইজার্স, পাঁচতলায় আনন্দের বসের ভুবনেশ্বরী ট্রেডিং কনসার্ন। বাড়িটা বছরখানেক হয়েছে। এই এক বছরেই সাতটা ফ্লোরে গাদা গাদা ছোট বড় কনসার্ন এসে ভিড় করেছে। ভুবনেশ্বরী এসেছে মাস ছয়েক আগে। আনন্দর সঙ্গে তারপর থেকে আলাপ ও বন্ধুত্ব হয়েছে। সে রীতিমতো কোয়ালিফায়েড, গুণী ছেলে যাকে বলে। কমার্সের খাসা একটা ডিগ্রি আছে। অথচ ভীষণ সাহিত্যরসিক সে। আমরা ক'জন ব্যর্থ শিল্পী-সাহিত্যিক (কবিও) মিলে এই পারুল ব্যাপারটা গড়ে তুলেছিলুম। অবশ্য পারুল নামে

আমাদের কারো কোন প্রেমিকা বা আত্মীয়া নেই—ওটা জাস্ট একটা নাম। অর্থাৎ রূপকথার সেই 'সাতভাই চম্পার এক বোন পারুল' আইডিয়া। তা, আনন্দ কীভাবে টের পেয়ে গিয়েছিল যে আমরা শিল্প-সাহিত্যের একদল বাউণ্ডুলে ছেলে। যেচে পড়ে সে আলাপ করতে এসেছিল। তাদের বিজ্ঞাপনের সব দায়িত্বও আমাদের মতো ক্ষুদে প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দিয়েছিল। সেই দিক থেকে একটা কৃতজ্ঞতা বোধ না ছিল এমন হতে পারে না। তবে, আসলে আনন্দের মধ্যে বন্ধুতার অনেক গুণ তো ছিলই। মাঝে মাঝে বেমক্কা রুচিবিগর্হিত স্ল্যাং বলে ফেললেও তার মধ্যে একটা তীক্ষ্ণ সংস্কৃতিবোধ আমরা লক্ষ্য করেছি এবং কালক্রমে আনন্দ আর আমাদের মধ্যে তুই-তোকারিও এসে পড়েছে।

তখন সময় কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে এগারোটা। শেখর রঞ্জন সেলিম কেউ তখনও আসেনি। তাদের আসতে বারোটা হয় সচরাচর। কোন নিয়মকানুনের বালাই অবশ্য নেই। শুধু আমাকে নিয়মিত সময় আসতেই হয়। কারণ এক অলিখিত চুক্তি অনুসারে নেতৃত্ব আমার কাঁধেই বর্তেছে। তাছাড়া, আমাদের কোন কর্মচারী নেই—এক বেয়ারা বা পিওন-কাম-বিল কালেক্টর মধুসূদন বাদে।

আনন্দ চোখ বুঁজে মাথাটা হেলিয়ে পা নাচাচ্ছিল। ওইভাবেই বলল—চা আনতে বল্।

মধু ফাইল ঝাড়পোঁছ করছিল। ধুলো না জমলেও তাকে এসব করতে হয়। চাকরি যাবার ভয় তার প্রচণ্ড। তাকে চা আনতে বললুম। সে তক্ষুণি কেটলি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

এবার আনন্দকে একটু তিরস্কারের ভান করে বললুম—মধুর সামনে বসের নিন্দে করছিস! জানিস বেয়ারাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ব্যাপার থাকে? তোদের বেয়ারার কানে তুলতে পারে—তারপর মিঃ গুপ্টার কানে ওঠা অসম্ভব নয়।

আনন্দ হাসতে লাগল।—মধু তেমন লোক নয়।

বললুম—মিঃ গুপ্টা কার প্রেমে পড়েছেন রে? ওঁর তো বউ ছেলেমেয়ে রয়েছে!

আনন্দ বলল—আরে, সে তো প্রথম পক্ষ।

—প্রথমপক্ষ! তাহলে দ্বিতীয়পক্ষ আছে নাকি?

—আছে তা কি আমিই জানতুম? কিছুদিন আগে জানতে পারলুম। আপন গড্, বিশ্বাস কর্, এ জিনিস বস কীভাবে ম্যানেজ করল ভাবা যায় না। বছর তেইশ-চব্বিশ বয়েস, স্লিম এ্যাণ্ড ট্রিম চেহারা, যাকে বলে বি—উ—টিফুল! আর সে কী গ্ল্যামার মাইরি! নির্ঘাত ফিলম-লাইন থেকে বোঁটা ছিঁড়ে তুলে এনেছে।

—দুই বউ এক জায়গায় থাকে না নিশ্চয়?

—পাগল! বড় বউ জানেই না কিছু। তাহলে তো গোড়াতেই জানতে পারতুম। ইনি থাকেন ক্যামাক স্ট্রীটের এক দশতলা বাড়ির সাততলায়। সে ফ্ল্যাটের বর্ণনা আমি দিতে পারব না। ওসব তোদের জিনিস। প্রথমে আমি তো ক্যাবারে গার্ল ভেবেছিলুম!

—কিন্তু আইনে তো দুটো বউ মানা।

আনন্দ উদাসীন সুরে বলল—কে জানে! বড় বউ তো জানে না কিছু।

—তাহলে তোরই ভুল হয়েছে। বউ-টউ নয়—জাস্ট মেয়েমানুষ!

—মোটেই না। বিবাহিতা স্ত্রী। এবং বাঙালী মেয়ে।

—বাঙালী মেয়ে!

—হ্যাঁ। গুপ্টাসায়েবের মা-ও তো বাঙালী মেয়ে। বুড়ী বোম্বে থেকে মধ্যে মধ্যে আসে। অবশ্য সেও কিছু জানে না। যথারীতি বড় বউয়ের কাছে গিয়েও ওঠে। গুপ্তাসায়েবের এই গুপ্ত ব্যাপারটা আমি আর দু-চারজন ছাড়া কেউ জানে না।

একটু ভেবে নিয়ে বললুম—তাই গুপ্টাসায়েব অমন চমৎকার বাংলা বলতে পারেন। এ্যাদ্দিনে বুঝলুম, তাই···

আনন্দ বাঁকা ঠোঁটে বলল—তুই সাহিত্যিক হলে কী হবে? সবকিছু বড্ড দেরিতে বুঝিস।

—যাক গে! তা আনন্দ, তোর বস অমন দ্বিতীয়পক্ষ থাকতে ফের প্রেমে পড়লেন কোথায়?

আনন্দ অবাক হয়ে বলল—তুই লিখিস কীভাবে? নির্ঘাত বিদেশী নভেল মেরে চালাস। আরে, সুন্দরী তরুণী বউয়ের প্রেমে পড়তে বারণ আছে মানুষের?

হাসতে হাসতে বললুম—ভ্যাট্! সে তো দাম্পত্যপ্রেম!

—বাঃ! দাম্পত্যপ্রেম প্রেম নয়?

—মোটেও না। ওটা পুরুষের স্ত্রৈণতা।

আনন্দ হতাশ ভঙ্গীতে বলল—তোর সঙ্গে তর্কে আমি [illegible]রব না। স্ত্রৈণতা কী জানি না, আমি শালা এক ব্যাচেলার। [illegible]মার চোখে ব্যাপারটা প্রেম ছাড়া কিছু নয়। তা না হলে ভাবতে পারিস, আমার বস গাড়ি বেচে ঊর্মিলাসুন্দরীর বায়নাক্কা মেটাচ্ছে! আপন গড্—অত ভালো গাড়িটা সতের হাজারে বেচে দিলে গুপ্টাসায়েব। বললে— আনন্দবাবু, তেলের যা আকাল পড়েছে, আর গাড়ি চাপা যাবে না। ভাবলাম, তাই হবে। উরে হালুয়া! পরদিন আমাকে যেতে বলল ক্যামাক ষ্ট্রীটের ফ্ল্যাটে। গেলাম। তারপর ঊর্মিলাসুন্দরীকে নিয়ে বেরোলেন। ট্যাক্সি করে আমরা চললুম সোজা ব্যারাকপুর। তখনও বুঝিনি কিচ্ছু। সেখানে গিয়ে দেখি, একটা পুরনো আমলের বাগানবাড়ি কেনা হচ্ছে। ছোট বউকে ইতিমধ্যে কবে এনে দেখিয়েছে। পছন্দও হয়েছে বিবির। এবার অ্যাডভান্স করা হবে। বিবির সামনেই সেটা করতে চায় গুপ্টাসায়েব।···

মধু চা আনল। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে আনন্দ ফের বলল— বাগানবাড়িটা কিন্তু অপূর্ব! সাত একর জায়গার মধ্যে একতলা বাড়ি—দুই পার্টে পাঁচটা করে দশটা ঘর। চারপাশে মাঠে অজস্র গাছপালা। ছ-ফুট উঁচু পাঁচিলের বাউণ্ডারি। লোকে বলে, দানিয়েল সায়েবের কুঠি।

—দানিয়েল সায়েবের কুঠি! অবাক হয়ে বললুম।

—কেন, চিনিস নাকি?

—নিশ্চয় চিনি। ওর মালিক ভদ্রলোককেও চিনি। সেলিমের এক মাসতুতো ভাই ওঁর কনসার্নে চাকরি করে। চিৎপুরে ব্যবসা আছে

মস্তোবড়ো। সেলিমের ভাইয়ের সূত্রে আমরা বার দুই ওখানে পিকনিক করে এসেছি। এবার জানুয়ারিতেও গিয়েছিলুম। রাত্রে ছিলুম আমরা। কিন্তু বাড়িটায় নির্ঘাত ভূত আছে রে!

আনন্দ খিকখিক করে হাসল।—তাহলে তো ভালই জমবে!

—সে এক অদ্ভুত রাত্রি ছিল! শেখররা তো মাল-টাল খেয়ে মেঝেয় গড়াচ্ছিল। আমার একেবারে ঘুম হয়নি। অদ্ভুত অদ্ভুত আওয়াজ শুনেছি সারা রাত!

আনন্দ গম্ভীর হয়ে বলল—বাড়িটার একটা হিস্ট্রি আছে।

—শুনেছি।

—দানিয়েল সায়েব ছিল মিলিটারির বড় অফিসার। রিটায়ার করে বাড়িটা বানায় ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে। সিপাহী বিদ্রোহের শুরু তো ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্টে। ব্যাটা অনেক সিপাহী মেরেছিল। পরে নাকি পাগল হয়ে যায়। তারপর···

আনন্দর বলার দরকার ছিল না। আমি সব জানতুম। বাড়িটা অনেকে কিনেছে, তারপর বেচে দিয়েছে। কারণ নাকি যে-ই কিনেছে, তারই একটা না-একটা অঘটন ঘটেছে। ফলে অনেককাল খালি পড়ে ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন সৈন্যরা ওখানে ছিল। কী একটা উপলক্ষ্যে নিজেদের মধ্যে মারামারি করে তাদের চারজন খুন হয়ে যায়। দলটাকে ছত্রভঙ্গ করে নানা জায়গায় বদলি করা হয়। তারপর ফের বাড়িটা খালি পড়ে ছিল। সরকারী সম্পত্তি তখন। সেই সময় শ্রীলংকার এক মুসলমান ব্যবসায়ী সাহস করে বাড়িটা কিনে নেন নেহাত জলের দামে। বাড়ির দোষ কাটাতে খুব ধুমধাম করে মৌলবি এনে মিলাদ অনুষ্ঠান হয়েছিল। শুধু তাই নয়, মৌলবি রেখে চল্লিশ রাত্রি কোরানপাঠের ব্যবস্থাও হয়েছিল। ভাবতে অদ্ভুত লাগে, একা এক বৃদ্ধ মৌলবি ওই ভূতুড়ে জনহীন বাড়িতে সারারাত জেগে সুর ধরে কোরানের শ্লোক উচ্চারণ করে যাচ্ছেন।

মৌলবি বলেছিলেন—বাড়িটায় দুষ্ট জিনের উপদ্রব আছে। তবে সবগুলোকে আমি এই আতরের শিশিতে ভরে ফেলেছি। নিয়ে গিয়ে

আরবসাগরে ফেলে দিয়ে আসব।

কিন্তু বর্তমান মালিক ইদ্রিস মিয়া বলেন,—তার আগে মৌলবি-সায়েবকে জিনগুলো কম জ্বালায়নি। মার্কিনিরা থাকার সময় ইলেকট্রিক লাইন নিয়েছিল। ফাটা ছাদে জল চুইয়ে সব্ ড্যামেজ হয়ে যায়। তারপর আর মেরামত হয়নি। নানাসায়েব (মাতামহ) কিনেছিলেন তো মাত্র দশ হাজারে। মেরামতি খরচা হিসেব করে দেখা গেল, বারো হাজারেও পার পাওয়া যাবে না। তাই উনিও বেচবার ফিকির খুঁজছিলেন। যাই হোক, মৌলবিসায়েব লণ্ঠন জ্বেলেই রাত কাটাতেন। এক রাতে কীভাবে তাঁর মশারিতে আগুন ধরে যায়। মশারির ভেতর বসে উনি কোরান পড়ছিলেন। সে এক কাণ্ড। বেরোতে গিয়ে লেপটালেপটি হয়ে দাড়ি টাড়ি পুড়ে একাকার হন। তবে অমন তেজী নাছোড়বান্দা মৌলবি দেখা যায় না। কোরান-পাঠ শেষ করে তবে আতরের শিশিতে জিন পুরে নিয়ে মক্কা রওনা হন। নানাসায়েব ওঁকে হজে যাবার মতো টাকাকড়ি দিয়েছিলেন।

ইদ্রিস মিয়ার ছেলেপুলে নেই। সুশিক্ষিত আধুনিক যুগের মানুষ ধর্মকর্মের ধার ধারেন না। ভূত-প্রেতে বিশ্বাস নেই একটুও। নানার মৃত্যুর পর এ সম্পত্তির মালিক হলেন তিনি। কলকাতায় এসে ব্যবসা পাতলেন। কিন্তু দানিয়েল কুঠিতে গিয়ে তাঁর চক্ষু চড়কগাছ। তখন দেশ ভাগ হয়েছে। দলে দলে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে চলে আসছেন। তাঁদের একটা দল বাড়িটা জবরদখল করে ফেলেছেন।

ইদ্রিস খান মানুষ হিসেবে দয়ালু সন্দেহ নেই। ছিন্নমূল পরিবারগুলোকে তাড়ানোর কথা তাঁর মাথায় আসেই নি। বরং তাদের সঙ্গে ভাড়ার বন্দোবস্ত করে নিলেন। কিন্তু ভাড়াটা দেবে কোত্থেকে? কেউ মাস গেলে কিছু দেয়, কেউ দেয় না। ভাড়া বাকি পড়তে লাগল। শেষ অব্দি মামলা করতে হল। মামলা চলল তিন-চার বছর ধরে। তারপর দখল পেলেন। ততদিনে অনেক পরিবার ওখান থেকে চলেও গেছেন। দখল নিতে গিয়ে দেখা গেল, একটি পরিবার বাদে আর কেউ নেই। কারণ?

কারণ, স্রেফ ভূত। কীভাবে হয়তো আতরের শিশির ছিপির ফাঁক গলিয়ে দু-একটা ভূত বেরিয়ে পড়েছিল। বেরিয়ে সোজা ফিরে এসেছিল নিজেদের পুরনো আস্তানায়। রাত দুপুরে কড়িকাঠে তারা বাদুড়ের মতো ঝোলে আর নাকি সুরে গান গায়। অদ্ভুত-অদ্ভুত রোগ জন্মায় বাসিন্দাদের শরীরে। নানা অঘটন ঘটে।

বাড়িটা তো এল হাতে। কিন্তু ওখানে কলকাতায় ব্যবসা রাখা আর এখানে এতবড় বাড়ি খালি ফেলে রাখা, দুটোর তাল সামলাতে ভদ্রলোক হিমশিম খাচ্ছেন। একজন নেপালী দারোয়ান রেখেছেন। সে বাউণ্ডারির গায়ে বানানো ছোট্ট ঘরটায় সপরিবারে থাকে। তাছাড়াও ইদ্রিস খান দুদিন অন্তর রাত্রে এসে ওখানে থাকেন। সঙ্গে থাকে আমাদের শিল্পী সেলিমের সেই মাসতুতো ভাই রন্টু। রোববার সারাটা দিনরাতই থাকেন ওঁরা। খানিকটা দূরে বস্তি এলাকায় হোটেলে খেয়ে আসেন। কখনও নিজেরাও রান্না করেন। কিচেনে রান্নার সব সরঞ্জামই রয়েছে। সামনের বড় হলঘরে দুটো খাটিয়া, একটা টেবিল আর গোটা দুই চেয়ার আছে। দেয়ালে পেরেক পুঁতে দড়ি টাঙানো হয়েছে কাপড়চোপড় রাখার জন্যে। একটা ক্যালেণ্ডারও দেখেছিলাম —সুন্দরী তরুণীর হাসিভরা মুখ।

দুবার গিয়ে আমরা খুব হই-হল্লা করেছিলুম। ওখানে অনেকেই কলকাতা থেকে ছুটির দিন গিয়ে পিকনিক করে আসে। কিন্তু চার্জ নেন ইদ্রিস। আমাদের অবশ্য কিছু দিতে হয়নি।

শুনেছিলাম, বাড়িটা বেচবার তালে আছেন ভদ্রলোক।' সত্তর হাজার দাম দিতে চেয়েছে কোন এক মারোয়াড়ী। ভেঙে কারখানা বানাবে। কিন্তু লাখের কমে দেবেন না ইদ্রিস। তবে লাখ টাকা পাওয়াও আপাততঃ লাক। যা বদনাম বাড়িটার! জেনেশুনে কি কেউ নিতে চাইবে? যারা জানে তারাই এসে দরাদরি করে। তার-পর পিছিয়ে যায়।...

সেই ভূতুড়ে বাড়ি গুপ্টাসায়েব তার তরুণী স্ত্রীর জন্যে কিনছেন শুনে

আমি রীতিমতো তাজ্জব বনে গেলুম। ওঁরা নিশ্চয় জানেন না বদনাম।

সেদিনই বিকেলে করিডোরে গুপ্টাসায়েবের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল যথারীতি হাত চেপে ধরে বলে উঠলেন—হ্যালো, হ্যালো, হ্যালো!

—কেমন আছেন সার?

—ভেরি গুড্। কোন তকলিফ নেই।

—ইয়ে, সেলিম বলছিল, ওর এক আত্মীয়ের কাছে শুনেছে নাকি—ব্যারাকপুরে দানিয়েল সায়েবের কুঠিবাড়ি আপনি কিনছেন? …খুব স্বাভাবিকভাবে বললুম কথাটা।

মিঃ গুপ্টা একটুও বিচলিত না হয়ে জবাব দিলেন—দ্যাটস্ রাইট। সেলিমের আত্মীয়—ও, বুঝেছি। বন্ধু? খানসায়েবের কর্মচারী তো?

—হ্যাঁ।

—বাড়ি কিন্তু অপূর্ব! আপনাকে নিয়ে যাব একদিন। লেখার ম্যাটার পাবেন যথেষ্ট।

একটু হেসে বললুম—আমি গেছি। এক রাত্রে ছিলুমও।

—তাই নাকি? বলে হো হো করে হাসলেন মিঃ গুপ্টা। —ভূতে জ্বালায়নি তো? কেউ কেউ আমাকে নিষেধ করছে, বাড়িটার খুব বদনাম আছে নাকি।

—আমিও শুনেছি। তবে ওসব সুপারস্টিশন তো থাকেই। সব পুরনো খালি বাড়ি কেন্দ্র করে নানান অদ্ভুত গল্প ছড়ায়।

—ইউ আর রাইট। সুপারস্টিশন! তবে আমার স্ত্রীর ভীষণ পছন্দ হয়ে গেছে। সত্যি বলতে কী, ও গোলমাল হই-চই একেবারে পছন্দ করে না। কলকাতায় এসে হাঁপিয়ে উঠেছে, যা ভিড়! ফ্ল্যাট ছেড়ে একবারো বেরোতে চায় না। বলে, রাস্তায় নামলেই গা ঘিন-ঘিন করে।

বলেই মিঃ গুপ্টা হাসতে হাসতে আমার হাত ধরে টানলেন।—আসুন না, আমার চেম্বারে। গল্প করা যাক্। মনটা খুব ভালো আছে আজ। ইমপোর্ট লাইসেন্সটার জন্যে খুব ছুটোছুটি করছিলুম।

এবার নাইনটি পারসেণ্ট সফল হওয়া গেছে। শুধু টেন পারসেণ্ট ঝুলছে—জাস্ট এ সিগনেচার। হয়ে যাবে! আসুন।

মিঃ গুপ্টার বয়স কমপক্ষে বাহান্ন হবেই। চুলে পাক ধরেছে নিশ্চয়, কিন্তু কলপ পরেন। চাঁছাছোলা ঝকঝকে মুখ, খাড়া নাক, ঠোঁটের কোনায় বুদ্ধিময় ব্যক্তিত্বের ছাপ স্পষ্ট। চোখে চশমা আছে, কিন্তু দৃষ্টি খুব জ্বলজ্বলে। হঠাৎ এই সাড়ে ছ'ফুট উঁচু বলিষ্ঠ ফরসা লোকটিকে দেখলে যুবক বলে ভুল হতে পারে। কিন্তু একটু পরে বয়সটা ধরা পড়তে বাধ্য। কারণ, হঠাৎ-হঠাৎ এমন গম্ভীর হয়ে পড়েন বা গুরুতর ভঙ্গীতে কথা বলে ওঠেন।

তাহলেও মিশুকে লোক। ওঁর চেম্বারে যাবার পথে আনন্দ কোনার টেবিল থেকে আমাকে বক দেখাল।

চেম্বারটা ছোট্ট। কিন্তু রুচির পরিচয় আছে গোছ-গাছে। ছোট্ট সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপর আর্টসের সামগ্রীও দু-একটা রয়েছে।

—হট না কোল্ড বলুন?

মার্চের দু তারিখ আজ। গরম পড়েও এবার যেন পড়ছে না। রাতের দিকে শিরশির করে শীত আসে। এ সময় হট কোল্ড আমায় কোনটাই ভাল লাগে না। বছরের এই সময়টা ভারি অদ্ভুত। ঠাণ্ডা খেলে মনে হয় ঠাণ্ডা লাগবে, গরম খেলে মনে হয় ভীষণ গরম লাগবে।

বললুম—কিচ্ছু না। এইমাত্র চা খেয়েছি।

-দেন, কফি?

—না। থাক্।

একটু চুপ করে থেকে দুলতে দুলতে মিঃ গুপ্টা বললেন—আপনি কী বলেন?

—কিসের?

—বাড়িটা। আমার স্ত্রীর ভীষণ পছন্দ। সে তো এ বেলায় পেলে ও বেলায় গিয়ে ওঠে! আসলে হয়েছে কী জানেন, ও বোম্বের শহরতলী এলাকায় এমন জায়গায় মানুষ, যেখানে কোন ভিড় নেই, গোলমাল নেই, স্রেফ নির্জন একটা-একটা বাড়ি—প্রচুর ফাঁকা জায়গা,

বাগান, গাছপালা! ছোট ছোট হিলকও রয়েছে অন্যদিকে সী-বীচ। কলকাতা ওর একদম পছন্দ নয়। এখানকার অ্যাসোসিয়েশনেও ও ঠিক মানিয়ে নিতে পারছে না। তাই বাইরে একটা বাড়ি খুঁজছিলাম। মিলেও গেল। কিন্তু···

ওঁকে চুপ করতে দেখে বললুম—তাহলে আর কিন্তু কী?

—কিন্তু আমি তো সারাদিন এখানে থাকব। ও একা কীভাবে ওখানে কাটাবে?

—একজন আয়া-টায়া ঠিক করে দিন। সারভান্টও দরকার হবে।

—দেখা যাক্। মোটা টাকা অ্যাডভান্সও করা হয়েছে। পাকা রিসিপ্ট বা ডিড কিচ্ছু হয়নি এখনও। নব্বই হাজারে রফা হয়েছে। ইন ইকোয়াল সিক্স ইয়ারলি ইনস্টলমেণ্টে টাকা শোধ করতে হবে। এমন চান্সের সুযোগ হয় না। ওনার ভদ্রলোক রিয়ালি এ ভেরি কাইণ্ডহার্টেড ম্যান। যদ্দিন টাকা পুরো শোধ না হয়, আমাকে উনি অর্ধেক অংশ দখল দিচ্ছেন। তবে ভাড়াটে হিসেবে!

—ভাড়াটে হিসেবে! সে কী? ভাড়াও দিতে হবে নাকি?

—সামান্য। মাসে একশো টাকা। তবে কিস্তি শোধ হলে ভাড়ার টাকাটা পুরো ফেরত পাব আমি। এর চেয়ে আর কতটা বেনিফিট আশা করা যায় বলুন? তার মানে ছ' বছরে কথামতো টাকা শোধ হলে আমি ফেরত পাচ্ছি বাহাত্তর শো টাকা।

—একেবারে নিলেই তো পারতেন!

হেসে উঠলেন মিঃ গুপ্টা।—মশাই, কী ভাবেন আমাকে! স্রেফ পরের টাকায় ব্যবসা করি। ধার-দেনায় ডুবে আছি। ব্যাঙ্কের লোনের সুদই দিতে হয় মাসে দেড় হাজার টাকা। বাইরে ঠাঁট বজায় রেখেছি মাত্র। তবে ইট ইজ সিওর, ইমপোর্ট লাইসেন্সটা হাতে এসে গেলেই তখন দেখবেন প্রকাশচন্দ্র গুপ্টা কী কাণ্ড করে!

উনি আবার হেসে উঠলেন। আমার মাথায় ওঁর এই স্ত্রীমহোদয়া সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন গজগজ করছিল। কিন্তু অন্যের ব্যক্তিগত ব্যাপারে

নাক গলানো যায় না। শেখরটা থাকলে অবশ্য আলাদা কথা। সে এসব ব্যাপারে যেমন নির্ভীক, তেমনি বেহায়া। কিন্তু আমিও নিজেকে 'দাবায়ে রাখতে' পারলুম না! অভিমানী সুরে বললুম—মিঃ গুপ্টা, এটা কী হচ্ছে বলুন তো?

—কী, কী? বলে ঝুঁকে এলেন মিঃ গুপ্টা।

—অমন গুণবতী বউদির সঙ্গে একবারও আলাপ হল না এ অভাগার!

—নিশ্চয়, নিশ্চয়। কেন নয়? আসুন না একদিন!

—বাঃ! কোথায় যাব, কখন যাব—তার ঠিক নেই···

বাধা দিয়ে মিঃ গুপ্টা বললেন—আনন্দ আপনাকে নিয়ে যাবে। সামনের রোববার আসুন। বলে কোন গুপ্তস্থানে চাবি টিপলেন। ঘণ্টা বাজল।

একজন বেয়ারা এল। বললেন—আনন্দবাবুকো বোলাও!

একটু পরেই আনন্দ এসে দাঁড়াল। আমার সঙ্গে তার প্রবল বন্ধুতা—অথচ তার বসের সামনে এখন বসে আছি এবং বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়া, তাই সে সপ্রতিভ হেসে আমাকে বলল—কতক্ষণ? আমি লক্ষ্যই করিনি তুই···

মিঃ গুপ্টা গম্ভীরমুখে বললেন—আনন্দ, তুমি এঁকে বাসা থেকে নিয়ে সামনের রোববার ক্যামাক স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে যাবে। ডোণ্ট ফরগেট দ্যাট। তোমার আবার কিচ্ছু মানে থাকে না। লিখে রেখো। সকাল ন'টা।

—আচ্ছা স্যার।

—ও-কে। এসো।

বেচারা আনন্দ বিরসমুখে চলে গেল। আমি বললুম—কেন? একা আমিও যেতে পারতুম! ওকে কষ্ট দিয়ে লাভ কী ছুটির দিনে?

—না। ওকেও ওদিন যেতে হবে। দরকার আছে। আপনার বাসা হয়ে আসবে। ও চেনে তো? সরি!···বলে ফের বোতাম টিপলেন।

বললুম—ওকে ডাকার দরকার নেই। আমি বলে দেব'খন।

—উঁহু। ভুলে যাবে।···সেই বেয়ারা এসে দাঁড়িয়েছিল তাকে বললেন—ফিন্ আনন্দবাবুকো বোলাও।

আমি মনে মনে হাসছিলুম। এবার আনন্দ এল কাঁচু-মাচু মুখে। হাতে একটা নোটবই, খোলা কলম।—স্যার?

—তোমাকে বললুম যে এঁকে বাসা থেকে নিয়ে যেতে হবে—আর তক্ষুণি ঘাড় নেড়ে বললে—আচ্ছা স্যার। কিন্তু চেনো এঁর বাসাটা কোথায়?

—না স্যার।

মিঃ গুপ্টা হেসে ফেললেন। আনন্দকে আপনারাই নিন বিজনবাবু। ও আসলে আর্টসলাইনের ছেলে, ভুল করে কমার্সে এসে পড়েছে! ভীষণ—ভীষণ আত্মভোলা! নিন, বলুন বিজনবাবু।

ওর হাত থেকে খাতাটা নিয়ে ঠিকানা লিখে দিলুম। দেখে আনন্দ বলল—আরে! আমার বড়দার বাসার কাছেই তো! ঠিক আছে

ও চলে গেলে মিঃ গুপ্টা বললেন—আপনার বউদি ভীষণ বই-টই পড়ে। আপনার তো বই-টই আছে। পারেন তো একটা নিয়ে যাবেন. ভাব হয়ে যাবে!

এই সময় সেই বেয়ারাটা ঢুকে আমাকে বলল—আপকা লিয়ে সলিম সাহাব ইন্তেজার করছে, স্যার। বহুৎ জরুরী কাম আছে অভি আভি এসেছিল।

বিরক্তমুখে উঠে দাঁড়ালাম। — চলি মিঃ গুপ্টা।

উনি কাগজের পাতায় চোখ রেখে বললেন—ওকে উইশ ইউ গুড্ লাক। রোববার সকাল নটা। রাইট?

—নিশ্চয়।

আমাদের অফিসে আসতেই সেলিম তেড়ে এল। —শালাকে আজ মেরেই ফেলব। কী ফুসুর ফুসুর করতে গিয়েছিলি রে গুপ্টার কাছে? ওর দ্বিতীয় পক্ষ ডাইনী মেয়েছেলে তা জানিস? রক্ত চুষে ছিবড়ে করে ফেলবে—মরে যাবি বলছি। এখন শোন্, মোহিনী

জুয়েলার্স পেমেণ্ট দেবে না। নট এ সিঙ্গল্ ফার্দিং।

ঘাবড়ে গেলুম তক্ষুণি। সর্বনাশ! ওদের বিজ্ঞাপনের টাকা থেকে বরাবর মোটা কমিশন আমরা পেয়ে থাকি। এই বিজ্ঞাপনটা ছিল চারটে দৈনিকে। কম করেও শ'পাঁচেক আমাদের পাওনা। এর দিকে হাপিত্যেশ করে সবাই বসে আছি। দৈনিকগুলো আমাদের কাছে যথারীতি বিল পাঠিয়েছে। অথচ পেমেণ্ট দেবে না পার্টি, এর কী মানে হয়?

হাঁ করে তাকিয়ে আছি দেখে সেলিম বলল—বিজ্ঞাপনে যা ছবি দিয়েছ তোমরা, মোহিনী জুয়েলার্সের বুড়ো মালিক আগুন হয়ে গেছে! আমাকে তো জুতো ছোড়ে আর কী!

—বাঃ! ওরা তো ডিজাইন ম্যাটার সব এ্যাপ্রুভ করেছে!

—কে করেছে? খোদ মালিক করেছে কি? মালিকের নাতি তা একরত্তি চ্যাংড়া। তার সইয়ের কোন দাম নেই।

শেখর চুপচাপ বসেছিল। বলল—সিল তো দিয়েছে। চালাকি াকি? মামলা করব।

বললাম—বুড়োর বক্তব্য কী?

সেলিম বলল—ছবিটা অশ্লীল। তার ওপর নাকি ভুল হিসট্রি বলা হয়েছে। প্রাচীন ভারতবর্ষে মেয়েরা ন্যাংটো থাকত বলে কোন ঘাটাচ্ছেলে?

—যা বাবা! ন্যাংটো কোথায়? বুকে কাঁচুলি, কোমরে ঘাগরা! ও তো জাস্ট কালিদাসের নায়িকা!

সেলিম বলল—বোঝা গে না বুড়োকে। আমি ভাই আর যাচ্ছি নে!

রঞ্জন বাইরে থেকে ঢুকে বলল—হলটা কী? চ্যাঁচাচ্ছিস কেন?

বললুন—হল মাথা আর মুণ্ডু! সেলিম, তুই কিন্তু ছবিটা েকেছিস! মাইণ্ড ছ্যাট! তখনই আমি বলেছিলুম—যে মেয়েরা মন ন্যাংটামি মানত, তারা সোনারূপোর গয়না পরত না। স্রেফ ল আর পাতা দিয়ে সাজত। তুই শুনলিনে!

সেলিম বলল—থাম্। ইতিহাসের পণ্ডিত তুই।

রঞ্জন বলল—ঠিক আছে। গোলমাল পরে করিস। আমাকে বুঝিয়ে বল্ তো, কী হয়েছে।

ওকে সেলিম বোঝাতে থাকল। আমি শেখরকে বললুম—এই, চল্—তুই আর আমি ব্যাপারটা দেখে আসি।

শেখর বলল—ছেড়ে দে। টাকা ওর বাপ দেবে।

—সবটাতেই তোর ওই? পেমেণ্টটা না পেলে আমাদের নামে কেস করে টাকা আদায় হবে জানিস?

শেখর হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়াল।—চল্, দেখে আসি। এক মিনিট, সেই অজন্তা সংক্রান্ত ইংরিজি বইটা সঙ্গে নিই। বুড়োর তাক লেগে যাবে।

আমরা বিশাল সেই ভারি কেতাবটা নিয়ে এক বুড়ো মক্কেলের সঙ্গে লড়তে বেরোলুম।

দুই

বিজনের বিবৃতি

সেই রোববার আসার আগেই অপ্রত্যাশিতভাবে আলাপ হয়ে গেল উর্মিলা গুপ্টার সঙ্গে। শনিবার বিকেলে আর সব অফিস তখন বন্ধ হয়ে গেছে। আনন্দকেও যেতে দেখেছি। যাবার সময় সে একটা অদ্ভুত ইশারা করে গিয়েছিল, তখন বুঝিনি। একটু পরে বুঝলুম—যখন গুপ্টাসায়েব বাইরে থেকে সাড়া দিলেন—মে উই কাম ইন জেন্টলমেন?

আমরা চারজনে কেউ টেবিলে কেউ চেয়ারে পা তুলে গ্যাঁজাচ্ছিলুম। তক্ষুনি সিরিয়াস হয়ে নড়েচড়ে বসলুম। সেলিম লাফ মেরে খাড়া হল। রঞ্জন হকচকিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকাল। শেখরের চোখদুটো গোল হয়ে যেতে দেখলুম।

আনন্দর বর্ণনায় বাড়াবাড়ি তো ছিলই না, বরং বেচারার ভাষায় কুলোয় নি—শ্রীমতী উর্মিলা (পরে জানতে পারি ওঁর নাম আসলে উর্মিমালা) প্রচণ্ড পরীমূর্তি, অবিশ্বাস্য শরীর! আমি ওঁর ডানাদুটোও দেখতে পাচ্ছিলুম। পরে রঞ্জন বলেছিল, আরব সাগরের এই ঢেউ গঙ্গা নদীর সব জেটি ভাসিয়ে দেবে।

হালকা নীল শাড়ির জমিনে সোনালী বিন্দুর ঝিকিমিকি, জোরালো আবেগের মতো দুই স্বাধীন বাহু, ডিমালো খোঁপায় গোঁজা একটি তাজা গোলাপ ইত্যাদি মিলে মিসেস্ গুপ্টার অস্তিত্ব আমাদের ছোট্ট ঘর ভরে দিল। তীব্র সুগন্ধের ঝাঁঝ ভনভন করে উঠল। মনে হল, গন্ধটা এ ঘরে চিরকাল থেকে যাবে।

কর্নেল—২

সুন্দর কিছু দেখলেই বরাবর আমি সেন্টিমেণ্টাল হয়ে পড়ি। ধুরন্ধর মিঃ গুপ্টা নিশ্চয় টের পেলেন আমাদের চার আনাড়ি ব্যাচেলারের হকচকানি ভাব। মৃদু হেসে বললেন—আলাপ করিয়েই দিই। উর্মি, এনারা সেই শিল্পী-সাহিত্যিক গ্রুপ! আর…

বলার দরকার ছিল না। চারজোড়া হাত এক সঙ্গে নমস্কার করল। জবাবে শ্রীমতী উর্মিও ঠিক ফিল্মস্টারের ঢঙে নমস্কার করলেন। ঠোঁট থেকে সেন্টের ফোঁটার মতো হাসি ঝরে পড়ল। তারপর বললেন—বিজনবাবু কে?

খুশিতে ভরে গেলুম। মিঃ গুপ্টা বললেন—উনি বিজন আচার্য, ইনি রঞ্জনবাবু…

রঞ্জন বলে দিল—রায়।

—ইয়া। রঞ্জন রায়। আই থিংক, হি ইজ এ পোয়েট।

শেখর বলল—আমি শেখর ব্যানার্জি। ছবিটবি আঁকি।

সেলিম ভুরু কুঁচকে তাকিয়েছিল। এবার শুধু বলল—আমি সেলিম আমেদ।

হঠাৎ উর্মি তার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাকালেন। কেমন যেন চমকে উঠলেন মনে হল। ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক হল—কিন্তু শুধু 'আচ্ছা!' বলে থেমে গেলেন।

এতক্ষণে বললুম—দাঁড়িয়ে কেন আপনারা? বসুন, বসুন!

মিঃ গুপ্টা ব্যস্তভাবে ঘড়ি দেখে বললেন—না ব্রাদার। বসা যাবে না। জরুরী অ্যাপয়েন্টমেণ্ট আছে। উর্মি এল, তো ভাবলুম আপনাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। এনিওয়ে, উর্মি, এঁদের তাহলে কাল সকালে চায়ের জন্যে ইনভাইট করি?

উর্মি একটু হাসলেন—কেন নয়? বিজনবাবুর তো যাবার কথা ছিল, বলছিলে!

শেখররা আমার দিকে ট্যারা চোখে তাকাল। বললুম—আমার নামটা আপনার জানা আছে দেখছি! এমন কোন সুকৃতি আমার আছে কি?

মিঃ গুপ্টা বললেন—খু-উ-ব। খু-উ-ব! উর্মি ভীষণ ফিল্ম ম্যাগাজিন পড়ে! আপনার লেখার ফ্যান!

এটা মিঃ গুপ্টার বাড়াবাড়ি হতে পারে। কারণ এসব স্ত্রীলোক বাংলায় আদৌ কিছু পড়েন বলে আমার ধারণা নেই। যা পড়েন, তা ইংরিজী ট্যাঁস ধরনের আজেবাজে সব পত্রিকা—যাতে বিজ্ঞাপনই বেশি টানে পাঠককে।

কিন্তু উর্মি বললেন—নববঙ্গ পত্রিকায় আপনার একটা থ্রিলার পড়লুম। ভালো লেগেছে।

বলে কী! থ্রিলার আমি কবে লিখলুম? স্রেফ গুল ঝাড়ছে। আমতা আমতা হাসতে হয় এসব ক্ষেত্রে। ও আর এমন কী লেখা, বাজে, ইত্যাদি বলতে হয়।

উর্মি পরক্ষণে ফের বলে উঠলেন—মেয়েরা প্রেমিককে খুন করতে পারে কি না, আই ডাউট! তবে আপনি নিশ্চয় অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন! দ্যাটস্ এ্যান এক্সেপশান, আই থিংক!

তাহলে সত্যি পড়েছেন তো? কিন্তু ওটা থ্রিলার হতে যাবে কেন? নিছক প্রেমের গল্প। প্রেম নিয়ে চিরকাল একটু-আধটু খুনোখুনি কি হয়ে আসছে না?

তারপর হঠাৎ আমাদের চমকে দিয়ে সেলিমের দিকে ঘুরে বলে উঠলেন—আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো?

সেলিম আস্তে জবাব দিল—বোম্বেতে।

ভুরু কুঁচকে স্মরণ করার চেষ্টা করলেন উর্মি। ঠোঁটের একটুখানি কামড়ে ধরলেন।—বোম্বে ইজ এ বিগ প্লেস। ঠিক কোথায়…

—বান্দ্রায়। মিঃ লাহিড়ীর ষ্টুডিওতে।

—লাহিড়ী! ও! দ্যাট পেইণ্টার!

—হ্যাঁ। তাছাড়া অবনীদার পাশেও আমাকে দেখেছেন! ফিল্ম ডাইরেকটার।

—তাই বুঝি!…বলে উর্মি স্বামীর দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন।

মিঃ গুপ্টা ঘড়ি দেখলেন আবার।—ওকে ফ্রেণ্ডস? আজ চলি।

তাহলে কথা রইল, আগামী কাল সকালে আপনারা কাইগুলি ম্যানেজ করে চলে যাবেন। বাই দ্য বাই, আনন্দকে একটু অন্য কাজে ব্যস্ত থাকতে হবে। ওকে পাচ্ছেন না। আমি রাস্তার ডাইরেকশন দিচ্ছি।...

একটু পরেই গুপ্টা দম্পতি চলে গেলেন। তখন সেলিমকে ধরলুম আমরা —এ্যাই শালা! শিগগির! ফ্ল্যাশ ব্যাক এক্ষুনি!

সেলিম গম্ভীর হয়ে বলল—আরে বাবা, তেমন কিছু নয়। গত বছর বোম্বেতে কয়েক মাস হন্যে হয়ে ঘুরছিলুম, তখন ভদ্রমহিলাকে নানা জায়গায় নানা ব্যাপারে দেখেছিলুম!

শেখর বলল—নানা ব্যাপারটা কী?

—লাহিড়ীদার নাম শুনেছিস? তুই তো একজন 'শিল্পী'

--জ্ঞানেশ লাহিড়ী? সে তো কমার্শিয়াল আর্টিস্ট!

- পেট চালাতে হবে না? যেমন তুইও চালাচ্ছিস

শেখর তেড়ে কী বলতে যাচ্ছিল, আমি বাধা দিয়ে বললুম—স্টপ ইট্। সেলিম, ফ্ল্যাশব্যাকটা চালিয়ে যা।

সেলিম বলল—তখন ওঁর নাম ছিল মিলি সেন। মডেল হয়ে পয়সা রোজগার করতেন। কখনও ঘোরাঘুরি করতেন। অবনীদা একটা হিন্দী ছবিতে ছোট্ট রোল দিয়েছিলেনও। তেমন সুবিধে করতে পারেন নি। চেহারা থাকলেই তো হয় না! স্ক্রিন টেস্টে তেমন ওৎরাতে পারেন নি, তার ওপর ভয়েস কেমন ক্র্যাকপড়া—লক্ষ্য করলি নে?

রঞ্জন বলল -যাঃ! অমন চেহারা স্ক্রিন টেস্টে ওৎরাল না? কোন্ শালা ক্যামেরাম্যান ছিল রে?

সেলিম বলল—বাজে বকিস নে! অবনীদা নিজেই নামকরা ক্যামেরাম্যান। তিনটে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছেন।

শেখর বলল—গলার স্বর তো বেশ মিঠে লাগল!

সেলিম—বল্ না, সাউণ্ড রেকর্ডিং ঠিকমতো হয় নি! ও সব তোরা বুঝবি নে!

আমি বললুম—তা ভদ্রমহিলা এই গুপ্টার ঘাড়ে এসে চাপলেন শেষ অব্দি? ব্যাপারটা খুব রহস্যময় মনে হচ্ছে।

রঞ্জন বলল—তোর অবনীদাকে চিঠি লেখ না!

—কেন?

ব্যাপারটা ডিটেলস জেনে নে

—লাভটা কী?

শেখর বলল—কিছু জানা। অর্থাৎ জ্ঞান অর্জন। মানুষের এটা স্বভাব। জ্ঞানের জন্যেই তো মানুষকে স্বর্গ থেকে চলে আসতে হয়েছিল।

রঞ্জন বলল—তাছাড়া, তোরও টু পাইস রোজগার হতে পারে সেলিম।

সেলিম বলল কিসে?

—ব্ল্যাকমেইল করবি মিসেস্ গুপ্টাকে। বলবি, মালকড়ি না ছাড়লে পুলিসে জানিয়ে দেব যে, আপনি একজন ফেরারী আসামী।

সেলিম চটে গিয়ে বলল—তোরা সবতাতেই বাড়াবাড়ি করিস। উনি ফেরারী আসামী কে বলল তোকে?

এইসব কথাবার্তা বিকেল পাঁচটা অব্দি চলল আমাদের। তারপর অফিসে তালা আটকে একটা বারের দিকে বেরিয়ে পড়লুম।...

পরদিন সকালে আমার বাসায় এসে জুটল ওরা। রঞ্জন এল ঢাকুরিয়া থেকে, শেখর এল পাইকপাড়া থেকে, আর সেলিম এল পার্ক সার্কাস থেকে। আমি থাকি রিপন স্ট্রিটের এক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান অধ্যুষিত বাড়িতে—ছাদের ওপর একটা মোটামুটি ভাল ঘর।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে ক্যামাক স্ট্রিটে গেলুম। গেটে লেখা: দা ইভনিং ভিলা। অদ্ভুত নাম! কোন ধনী সায়েবের বাড়ি ছিল। এও এক বাগানবাড়ি বলা যায়। পুরনো ভিতে মাল্টিস্টোরিড দালান গড়া হয়েছে। টেনিসলন আর বাগিচা আছে। লিফট আছে।

দরজা খুলে মিঃ গুপ্টা আমাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন। এ

কোথায় এলুম ! প্রকাণ্ড বসার ঘর, পুরোটায় লাল কার্পেট, মধ্যিখানে একটা সোফা সেট। দেয়ালের ধারে বিশাল পিয়ানো রয়েছে। এখানে-সেখানে ছোটবড় ভাস্কর্য, দেয়ালে মডার্ন আর্ট, কোনায় একটা সেলফে চমৎকার গোছানো বইপত্তর। ভঙ্গীটা সেকাল-একালে মেশানো।

আমাদের বসতে বলে গুপ্টা গেলেন। শেখর চোখ টিপে ফিসফিস করে বলল—মেয়েমানুষের জন্যে কত কী দিতে হয় রে ! ভাবা যায় না।

রঞ্জন কী বলতে যাচ্ছিল, সেই সময় উর্মি একরাশ সেন্টের গন্ধ নিয়ে বেরিয়ে এলেন হাসিমুখে। আজ খোঁপা নেই। সদ্য স্নানের আভাস দিচ্ছে খোলা চুল। ঘিয়ে রঙের তাঁতের শাড়ি পরনে, খুব স্বাভাবিক চেহারা। ঠোঁটে রঙ বা কোন প্রসাধন নেই। আমার তো মনে হল, নিতান্ত কচি কলেজ গার্ল হয়ে উঠেছেন ভদ্রমহিলা ! বয়স কম দেখাচ্ছে আজ। স্নিগ্ধতা ফুটে উঠেছে। নমস্কার করতে করতে এলেন। কার্পেটেই বসে পড়লেন। আমরাও ব্যস্ত হয়ে সোফা ছেড়ে নেমে বসলুম। সারা ঘর গন্ধে মউমউ করছিল।

উর্মি বললেন—ভীষণ আনন্দ হচ্ছে, আপনারা এসেছেন ! ফ্ল্যাটটা বেশ বড়—এত একা লাগে ! হাঁপিয়ে উঠি। ও তো কাজের মানুষ। একা থাকতে হয়।

বললুম—মিঃ গুপ্টা বলছিলেন, আপনি নাকি নির্জনতাই পছন্দ করেন !

—কে জানে ! বলে অস্ফুট হাসলেন উর্মি।—তবে বেশি ভিড়ও ভাল লাগে না। আপনাদের কলকাতায় বড্ড ভিড় কিন্তু।

শেখর বলল—যা বলেছেন ! কলকাতায় আর থাকা যাবে না। বর্ষার অবস্থা দেখলে তো আরও ভয় পাবেন।

—বর্ষার অনেক পরে এসেছি। তবে সব শুনেছি অলরেডি রাস্তাঘাট সব ফ্লাডেড হয় নাকি।

আমি বললুম—কিন্তু আগামী বর্ষার অনেক আগেই তো ব্যারাকপুরের বাড়িতে চলে যাচ্ছেন ?

উর্মি খুশি হয়ে তাকালেন আমার দিকে। -কথা তাই। বাড়িটা

আমার খুব পছন্দ হয়েছে।

রঞ্জন বলল—আমরা সেখানে মাঝে মাঝে যাই কিন্তু। পিকনিকের স্পট হিসেবে চমৎকার!

- তাই বুঝি!

এই সময় মিঃ গুপ্টা বেরিয়ে এলেন। স্ত্রীর কাছাকাছি বসে পড়লেন। বললেন—বেডরুমে এয়ারকণ্ডিশনারটা সারানো হচ্ছে। মিস্ত্রী এসেছে। তাই দেরি হল। কিছু মনে করবেন না ব্রাদার!

ওরে বাবা! বউয়ের জন্য শোবার ঘরে এয়ারকণ্ডিশন! ভাবা যায় না। আমরা নিশ্চয় চমৎকৃত হয়ে বোকার মতো হাসলুম। তার-পর নানান গল্পগাছা চলতে থাকল। একফাঁকে ফের গুপ্টা কাজ দেখতে ভেতরে চলে গেলেন।

এতক্ষণ সেলিম চুপচাপ বসে ছিল। তার দিকে তাকিয়ে ঊর্মি বলল—আপনি কিন্তু কোন কথা বলছেন না!

শেখর বলল—কী রে? পেটব্যথা করছে নাকি?

আমরা হেসে উঠলুম। সেলিম ঊর্মির দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলল—আচ্ছা মিসেস গুপ্টা, অবনীদার সঙ্গে আপনার আর যোগাযোগ নেই?

ঊর্মি একটু অপ্রস্তুত হলেন যেন।—না, মানে, ফিল্মের লাইনে আমার চেনাজানা খুব কমই ছিল। তাই যোগাযোগের প্রশ্ন ওঠে না।...পরক্ষণে একটু হাসলেন।—তবে সে একটা চাইল্ডিশ্ ব্যাপার। আমার নেশা কেটে গেছে অলরেডি।

রঞ্জন সোৎসাহে বলল—কেন, কেন? আপনি তো দুর্দান্ত হিরোইন হতে পারতেন!

ঊর্মি মাথা দোলালেন। কিন্তু লক্ষ্য করলুম, সেলিম যেন জেনে বা না জেনে ওঁকে কোথায় আঘাত করে বসেছে। সেলিমটা বড্ড একগুঁয়ে।

গুপ্টাসায়েব আবার এলেন। তাঁর সঙ্গে একটা ছোকরা ট্রেতে চা-ফা আনছে দেখা গেল। একগাদা সব চানাচুর, কয়েকরকম বিস্কুট,

সন্দেশও আছে। কিছুক্ষণ জমকালো ভঙ্গীতে খাওয়া চলতে থাকল।

এক সময় মিঃ গুপ্টা বলে উঠলেন—দা আইডিয়া! উর্মি, আমরা তো নাইনটিনথ মার্চ একটা ছোটখাট পার্টি দিতে পারি!

শেখর বলল—অকেশানটা কী?

—বাগানবাড়িতে ওদিনই যাচ্ছি আমরা।

উর্মি বলল—বেশ তো। ইউ অ্যারেঞ্জ! আমার ভাল লাগবে।

উর্মির মধ্যে একটা রূপান্তর ঘটেছে, আমি অন্ততঃ টের পাচ্ছিলুম। তার সেই স্মার্টনেস, ঔজ্জ্বল্য কেমন যেন মিইয়ে গেছে কখন। সন্দেহ ঘনীভূত হল। সেলিম নিশ্চয় কোথায় আঘাত করে বসেছে। আমাদের দলে ওর উপস্থিতিটা যেন উর্মি সইতে পারছেন না অস্বস্তি অনুভব করছেন।···

সেদিন চায়ের পার্টিটা অবশ্য জমানোর চেষ্টা করা হল খুব। গুপ্টা-সায়েবের রসিকতা, শেষে শেখরের রবীন্দ্রসঙ্গীত, সেলিম পিয়ানো বাজালও চমৎকার, কিন্তু তা সত্ত্বেও উর্মির ভাবান্তর ঢাকা গেল না। ওঁর সুন্দর মুখের ওপর মাঝে মাঝে একটা ছাইরঙের আভা ভেসে উঠতে লাগল।···

পরদিন সেলিম বলেছিল, অবনীদা শিগগির কলকাতা আসছেন শুনলুম। এলে সব জানতে পারব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মিলি সেন একটা সাংঘাতিক কিছু করেই বোম্বে থেকে চলে এসেছেন। মিঃ গুপ্টার পাশে ওঁকে স্ত্রী বলে কিছুতেই ভাবতে পারছিনে আমি। দেয়ার ইজ সামথিং মিস্ট্রিয়াস!

রঞ্জন বলেছিল—কিন্তু দিব্যি তো বাস করছেন দু'জনে একসঙ্গে!

—আজকাল অমন অনেকে থাকে। ওটা কোন ব্যাপার নয়।

আমি বলেছিলুম—তাহলে তুই বলছিস, ওঁকে মিঃ গুপ্টা বিয়ে করেন নি?

—হয়তো না।

—কেন না?

—আরে বাবা, গুপ্টার রীতিমতো বউ ছেলেমেয়ে সব রয়েছে তো

সে আমি খোঁজ নিয়েছি। উনি কাজের অছিলায় সপ্তায় তিনরাত্তির থাকেন মিলি সেনের কাছে, বাকি রাত্তির বড় বউয়ের কাছে। আনন্দটা সব জানে। জিগ্যেস করিস।

শেখরের 'সাইকলজি' নিয়ে বাতিক আছে। মাঝে মাঝে খুব সিরিয়াস ভঙ্গীতে সে আলোচনা করে। সে বলেছিল—তবে সবচেয়ে মিস্ট্রিয়াস ব্যাপার হচ্ছে সেণ্ট!

সেলিম ট্যারা তাকিয়ে বলেছিল—সেণ্ট মানে?

—গন্ধ। সুগন্ধ। সুরভি!

—তার মানে?

শেখর উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল।—ভদ্রমহিলা অত কড়া ঝাঁজের সেণ্ট ব্যবহার করেন কেন? বাড়াবাড়ি মনে হয় না তোদের? সবসময় সারা গায়ে সেণ্ট মেখে থাকেন যেন।

—হ্যাঁ! তুই শুঁকে দেখেছিস?

রঞ্জন বলেছিল— কোথায় নাক ঠেকিয়েছিলি রে?

শেখর রেগে গিয়ে বলেছিল—বুকে!

এরপর রসিকতাটা বাড়তে বাড়তে অশ্লীলতায় পৌঁছে গিয়েছিল নিশ্চয়। তাহলে শেখরের কথাটা ভাববার মতো। কোথাও একটা গা ঘিনঘিনে ব্যাপার না থাকলে সত্যি তো, অত বাড়াবাড়ি কেন সেণ্ট নিয়ে? সে-কি উর্মির শারীরিক ক্ষেত্রে কোন কদর্য স্মৃতির ব্যাপার? না কি আরও জটিল কিছু? উর্মি কি বাইরের সবকিছু নোংরা দুর্গন্ধময় মনে করেন? কেন মনে করেন? সুগন্ধিতে মানুষের—বিশেষ করে স্ত্রীজাতির আসক্তি খুব স্বাভাবিকভাবেই বেশি। কিন্তু উর্মির আসক্তিটা যেন মাত্রাহীন। আমি কল্পনায় মাঝে মাঝে উর্মির দেহের কোথাও কোথাও নাক ঠেকিয়ে পরীক্ষা করছিলুম। উরে ব্বাস! প্রতিটি লোমকূপে একগাদা করে দুর্মূল্য তরল সুরভি চবচব করছে! আমার বুক অজানা ভয়ে ঢিবঢিব করে ওঠে।

ইতিমধ্যে আনন্দ যথারীতি এসেছে। তার ওই এক কথা। তার বস প্রেমে পাগল হয়ে যাচ্ছেন। এরপর বড় বউকে না ডিভোর্স করে

বসেন, সেই ভয়। কারণ বড় বউ আজকাল আনন্দকে মাঝেমাঝে ডেকে পাঠান। আনন্দ বুঝতে পারে, কৌশলে স্বামীর দ্বিতীয় জীবন বা গতিবিধির খবর আদায় করতে চান ভদ্রমহিলা। আনন্দ বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না। চাকরি গেলে খুব বিপদে পড়ে যাবে।

এইসব জেনে বেচারা বড় বউটির প্রতি মমতা হচ্ছিল আমাদের। গুপ্টাসায়েবকে আর ভাল চোখে দেখতে পারছিলুম না। যত বেলেল্লাই হই, নীতিবোধ ইত্যাদি আমাদের সংস্কারে শেকড় বসিয়ে রয়েছে। তবে আশ্বস্ত হয়েছিলুম যে গুপ্টাসায়েবের কোম্পানিটি তার বড় বউয়ের নামে। এমন কি কয়েকটা ব্যাংক অ্যাকাউন্টও তাঁর নামে আছে। তাই তাঁর অজান্তে এক পয়সাও তোলা যায় না। আর সেজন্যেই বাগানবাড়ি কিনতে গুপ্টাকে গাড়ি বেচে ফেলতে হয়েছে। আনন্দ বলেছে, প্রথম পক্ষ খুব হিসেবী মানুষ। লেখাপড়াও জানেন। ভাল করে না বুঝে কোথাও সই করেন না।

শুধু একটা ব্যাপার অবাক লাগল। এমন গোপনীয় ব্যক্তিগত ব্যাপার গুপ্টাসায়েব আমাদের কাছে প্রকাশ্য করে তুললেন কেন? আনন্দ তাঁর কাছে হয়তো বিশ্বস্ত কর্মচারী। কিন্তু আমরা তো বাইরের লোক!

তাছাড়া প্রকাশ্যে উর্মি ওঁর অফিসে আসেন মাঝে মাঝে। অফিসের অন্য কেউ ওঁর প্রথমার কানে তুলে দেবার সম্ভাবনা প্রচুর। আনন্দ এর একটা ব্যাখ্যা দিয়েছিল। আজকাল দিশী সায়েবসুবোদের এমন সঙ্গিনী থাকে, এটা সবার গা সওয়া হয়ে গেছে। তাছাড়া চাকরি যাবার ভয় তো সবারই। কেন মিছিমিছি রিস্‌ক্ নেবে কেউ? লাভটা কী? চাকরি করতে এসেছে, মাইনে পাচ্ছে। বসের ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাতে চায় না কেউ।

তা ঠিক। আজকাল অনেক কিছু গা-সওয়া গেছে মানুষের। ক্রমশঃ সবাই নির্লিপ্ত হয়ে পড়ছে। নিজেদের জীবনেই লক্ষ-কোটি ঝঞ্ঝাট। পরের জীবন নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতে চায় না। মুখে পরচর্চা

একট-আধট করা যেতে পারে, তার বেশি উৎসাহ কারো থাকে না আজকাল।

এবং এ-কথা গুপ্টাসায়েব বোঝেন বলেই পরোয়া করছেন না। তিনি জানেন, আমরাও যথারীতি মাইণ্ড করবো না—যাকে বলে। নেহাত বড়বউয়ের প্রতি অনেক নৈতিক ও আবশ্যিক দায়-দায়িত্ব আছে, তাই সেক্ষেত্রে চক্ষুলজ্জা মেনে চলছেন। তবে কতদিন মেনে চলবেন, তাও অনিশ্চিত। কবে শুনব, ডিভোর্সের মামলা উঠেছে আদালতে। এমন তো আজকাল আকছার হচ্ছে। খবরের কাগজে কত খবরও বেরোচ্ছে।

তবে এই প্রথম কলকাতা শহরটাকে বড় রহস্যময় মনে হল আমার। বাপস, কী প্রকাণ্ড এই শহর! না—আয়তনের কথা ভাবছিনে। আশি-পঁচাশি লাখ লোক নিয়েই তার বিশালতাটা রহস্যময় হয়ে উঠেছে দিনে দিনে। এ শহরে যে কেউ তিনটে-চারটে কেন, দশটা বউ দশ জায়গায় মেনটেন করলেও কোন বউ কোন বউয়ের অস্তিত্ব টেরও পাবে না। চিৎপুরের কোন বউ ক্যামাক স্ট্রীটের কোন সতীনের খবর পেতে কত জন্ম লেগে যাবে! তাছাড়া এ শহরের বড গুণ, কেউ কারো খবর রাখে না, রাখতে চায় না। নাক গলায় না অন্যের পারসোনাল ব্যাপারে। মেট্রোপলিটন শহরের সব বৈশিষ্ট্য এখন কলকাতার গায়ে ঘায়ের মতো দগদগ করছে।...

এর মধ্যে হঠাৎ একদিন আনন্দ এসে আমাকে ফিসফিস করে বলল —শোন্, তোকে একবার যেতে বলেছিল, সেকেণ্ড লেডি। একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম বলতে।

অবাক হয়ে বললুম—আমাকে! কেন?

—ডাইনি তোর মেটেটা খুব পছন্দ করেছে! চলে যাস যে কোন সময়।

—কী বলিস যা তা! কেন যেতে বললেন, বলেন নি?

—না। ফোনে জেনে নে। এই নে, নম্বর দিচ্ছি। কিন্তু খবর্দার, কাকেও দিবিনে। বসের বারণ আছে। আর একটা কথা, ফোন

করার আগে দেখে নিবি, গুপ্টা অফিসে আছে নাকি।

—উনি ফোন করলেন না কেন?

—কেন করলেন না, আমি জানি নাকি? এখন তো গুপ্টা অফিসে আছে। তুই শ্রীমতীকে ফোন কর না! কী বলে শোন্।

বলে আনন্দ চলে গেল। ও এক অদ্ভুত ছেলে। যত কৌতূহল, তত ওর নিরাসক্তি সব ব্যাপারে। ভীষণ খামখেয়ালিও।

শেখর পিছনের চেম্বারে ছবি আঁকছিল। সেলিম নেই। রঞ্জন এ ঘরের কোনার টেবিলে ফাইল নিয়ে ব্যস্ত। ফোন আমার টেবিলে। দুরু-দুরু বুকে রিসিভার তুলে ডায়াল শুরু করলুম। রঞ্জন তাকাল না।

চাপা সুদূর রিঙের শব্দ ভয়ে ভয়ে সাড়া দিচ্ছিল ক্যামাক স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে। বার তিন বাজার পর বন্ধ হল। উত্তেজনায় আমার দম আটকে যাচ্ছিল। তারপর পৃথিবীর সবচেয়ে মিঠে শব্দ ভেসে এল—হ্যালো!

—মিসেস্ গুপ্টা বলছেন?

—কে আপনি?

—বিজন আচার্য।

—ও!

স্পষ্ট বুঝতে পারছিলুম, ওঁর কণ্ঠস্বর কেমন আড়ষ্ট মনে হচ্ছিল এর আগে, হঠাৎ যেন আশ্বস্ত হওয়ার আভাষ ফুটে বেরোল 'ও' শব্দটার মধ্যে। হয়তো একটু হাসিও শুনলুম। তারপর স্পষ্ট সুন্দর উচ্চারণে ঊর্মি বললেন—আপনি! কিন্তু আমার নাম্বার পেলেন কোথায়?

—আনন্দবাবুর কাছে।

—ও! আমি ওকে বলেছিলুম, আপনাকে আমার খুব দরকার। আচ্ছা, আপনি কি এখন খুব ব্যস্ত?

—না। তেমন কিছু নয়।

—মিঃ গুপ্টা কি এখন অফিসে? প্লীজ, একবার খোঁজ নিন না!

—নিয়েছি। অফিসেই আছেন।

—ওঃ! ওয়েল, আপনি যদি কিছু মনে না করেন, এখনই একটু

সময় করতে পারবেন ?

—খুব পারব।

—চলে আসুন না, প্লীজ !

—আসছি।

—হ্যালো, হ্যালো !

—আছি। বলুন।

—আপনার বন্ধু সেই আর্টিস্ট ভদ্রলোক কি আছেন এখন ?

—শেখর ?…সরি, সেলিম ? সেলিম নেই।

—ও। ঠিক আছে। চলে আসুন।

—সেলিমকে কিছু বলতে হবে ?

—না, থাক। আপনি আসুন। দেরি করবেন না কিন্তু। তাহলে দেখা না হতেও পারে।

ফোন রাখার শব্দ হল। এক মিনিট পরে আমি আমারটা রাখলুম। এতক্ষণ কানের ভিতর দিয়েই যেন মগজে হুশহুশ করে কড়া সুগন্ধের ঝাঁজ ঢুকছিল। সেই গন্ধ এখনও মউমউ করছে।

রঞ্জন মুখ তুলে বলল—কী রে ? অমন ভ্যাবলা হয়ে বসে আছিস কেন ?

নারভাস হয়ে পড়েছিলুম। সুন্দরী-শ্রেষ্ঠাদের সঙ্গে কথা বললে আমার এমন হয়। কিন্তু শ্রীমতি ঊর্মিমালা তো আস্ত সৌন্দর্য। হেসে বললুম—তুই শুনছিলি না ?

—শুনছিলুম। গুপ্টার ছোট বউয়ের কাছে যাচ্ছিস।

—যাঃ ! কিসে বুঝলি ?

—ওসব বোঝা যায়। যা। উইশ গুড লাক। কিন্তু সাবধান! কোনরকম বদ-মতলব নিয়ে যাসনে।

আমি হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালুম। রঞ্জন ডাকল—শোন্।

—কী ?

—গুপ্টাকে বেরোতে দেখলে আমি যাতে তোদের খবর দিতে পারি, শ্রীমতীর ফোন নম্বরটা আমাকে দিয়ে যা !

ও খুব গম্ভীর হয়ে কথা বলছিল। হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলুম।...

ক্যামাক স্ট্রীটে ট্যাক্সি থেকে নেমে ইভনিং ভিলার কাছাকাছি একটা দোকানে সিগ্রেট কিনছি, ফুরিয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ দেখি গেটের কাছে আরেকটা ট্যাক্সি এসে থামল এবং গুপ্টাসায়েব নামলেন আমি হতভম্ব।

ফোন লাইনে ট্যাপ করা আছে নাকি? পরে মনে হল, ব্যাপারটা নেহাত আকস্মিক। কিন্তু পয়সা খরচ করে এসে এভাবে অযথা ফিরতে হবে ভেবে রাগে বিরক্তিতে জ্বালা ধরে গেল। লোকটা অমন করে হঠাৎ-হঠাৎ ঊর্মির কাছে চলে আসে জানা ছিল না। এখন তো মোটে দুটো বাজে। একটু সরে গিয়ে গাছের নিচে একটা চায়ের আড্ডায় হাজির হলুম। বেয়ারা ড্রাইভার ইত্যাদি উর্দিপরা লোকেরা সেখানে আড্ডা দিচ্ছে। মাটির ভাঁড়ে চা খেতে খারাপ লাগে না। একপাশে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে চা-টা খেলুম। লক্ষ্য রাখলুম গেটের দিকে, কখন গুপ্টাসায়েব বেরিয়ে যান।

একটি ঘণ্টা কেটে গেল। হতাশ হয়ে ফেরার জন্য পা বাড়াচ্ছি, তখন দেখি গেটের কাছে গুপ্টাসায়েব একা নন, সঙ্গে শ্রীমতী ঊর্মি ও রয়েছেন—চোখে সানগ্লাস, গুপ্টা ট্যাক্সির জন্যেই দাঁড়িয়ে রইলেন সম্ভবতঃ।

হ্যাঁ, তাই। একটা ট্যাক্সি এসে খালি হতেই দু'জনে এগিয়ে চেপে বসলেন। ট্যাক্সিটা এদিকে এগিয়ে আসতে দেখে আমি ঘুরে দাঁড়ালুম এবং লোকগুলোর আড়ালে থাকার চেষ্টা করলুম।

ওঁরা অদৃশ্য হলে তারপর হাঁটা শুরু করলুম।

অফিসে ফিরে দেখি, সেলিম এসেছে। আমাকে দেখে রঞ্জন চেঁচিয়ে উঠল-- ফিরতে পেরেছিস? বেঁচে আছিস তো তুই?

সেলিম বলল—কেন ডেকেছিল রে?

শেখর বেরিয়ে এল পিছনের ঘর থেকে।—কী? জমেছিল তো খুব? ডিটেলস বলবি কিন্তু। নৈলে মেরে ফ্ল্যাট করে ফেলব।

রঞ্জনের দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে বললুম—এরই মধ্যে সব রটিয়ে বসে আছ!

রঞ্জন বলল—বেশ করেছি! এমন নোবেল প্রাইজ পেতে যাচ্ছিস, আর আমরা চুপ করে বসে থাকবো? নে—ঝেড়ে ফ্যাল ঝুলি। তারপর অগত্যা একটা করে বিয়ার আন।

সেলিম বলল—ফোনে আমার কথা জিগ্যেস করছিল, রঞ্জন বললে। কেন রে?

আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল ওরা। বসে বললুম—ব্যাড লাক, বয়েজ! গিয়ে দেখি, গুপ্টা ঢুকছে। একটু পরে শ্রীমতীকে নিয়ে বেরিয়ে ট্যাক্সি চেপে কোথায় চলে গেল। আমাকে দেখতে পায়নি। কারণ, আমি তখন ভাগ্যিস ঢুকিনি!

রঞ্জন বলল—কিন্তু গুপ্টা বেরোল কখন অফিস থেকে? বুঝেছি—বাথরুমে গিয়েছিলুম—তখনই! যাকৃগে, নেক্সট চান্স তো পাবি।

সেলিম বলল—খুব জটিল হচ্ছে ব্যাপারটা। অবনীদা—সেই ফিল্ম ডিরেকটার ভদ্রলোক এসে গেছেন! আমার সঙ্গে দেখা হল আজ কিছুক্ষণ আগে। গ্রেট ইস্টার্নে উঠেছেন। একজনের কাছে খবর পেয়েই গিয়েছিলুম।

রঞ্জন বলল—তারপর? উর্মিমালার কথা নিশ্চয় বললি!

বললুম—সে এক সাংঘাতিক কাণ্ড রে! মিলি সেন সত্যি ফেরারী আসামী। অবনীদার এক মাদ্রাজী বন্ধু একটা ছবি প্রোডিউস করছিলেন। তার ডাইরেকশানের ভার অবনীদাকে দেওয়া হয়। মাদ্রাজী ভদ্রলোক কোন এক সূত্রে মিলিকে চিনতেন। উনি তাকেই হিরোইন করার জন্যে জেদ ধরেন। এদিকে মিলি তো অবনীদার রিজেক্টেড জিনিস! প্রচণ্ড আপত্তি করলেন। কিন্তু টিকল না—ওকে নিতেই হবে। অগত্যা নিলেন। ওদিকে নায়কও কিন্তু সম্পূর্ণ নবাগত। যাই হোক, স্যুটিং শুরু হল যথারীতি। অবনীদা পাগল হয়ে যাবার দাখিল। ওই শিমুলফুল দিয়ে কাজ করানো দুঃসাধ্য তো! যাই হোক, আউটডোরে গিয়ে এক সাংঘাতিক ঘটনা। নায়িকা হচ্ছে

এক ডাকাতের পালিতা কন্যা—সেও ডাকাতনী হয়ে উঠেছে। নায়ক এক বড়লোকের ছেলে। বিয়ে করে গাড়ি চেপে বউ নিয়ে আসছে পাহাড়ী পথে। নায়িকা দলবল নিয়ে গাড়িতে হামলা করবে। নতুন বউয়ের গা ভর্তি গয়না, বাপের বাড়ির যৌতুকও রয়েছে প্রচুর। নায়ক গাড়ি থেকে বেরিয়ে রুখে দাঁড়াল মুখোমুখি। মিলি সেন ঘোড়ার পিঠ থেকে রিভলবার তুলেছে তাকে মারতে। দারুণ উত্তেজনার সিন! রিভলবার তাক করেই মিলি সেনের প্রেম জাগবে প্রচণ্ড। একটু হেসে—'আচ্ছা! ফির মিলেঙ্গী' বলে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যাবে। এখন হল এক অদ্ভুত কাণ্ড! রিভলবারটা তো স্বভাবতঃ নকল মাল। মিলি সেন তুলল। তারপর তিনবার প্রচণ্ড গুলির শব্দ হল এবং নায়ক 'বাপরে, মার দিয়া' বলে পড়ে গেল! হই-হই ব্যাপার। অবনীদা দৌড়ে গেলেন। প্রথমে বুঝতে পারেননি ভেবেছিলেন কোথাও একটা ভুল-বোঝাবুঝি হয়েছে। চিত্রনাট্যে তো এমন ঘটনা নেই! কিন্তু সর্বনাশ!...

শেখর অস্ফুট বলে উঠল - সত্যিসত্যি খুন নাকি?

—হ্যাঁ। মিলি সেন সত্যিকার রিভলবার দিয়ে হিরোকে মেরে ফেলেছে।

রঞ্জন বলল—কোন সত্যিকার কারণে নিশ্চয়!

সেলিম বলল—সেটাই রহস্য। কেন রূপেশকুমারকে মিলিকুমারী খুন করল, পুলিস আজও তা জানতে পারেনি। পরস্পর আলাপও ছিল না। তদন্তে সেটা জানা যায়।

আমি বললুম—তারপর কী হল? ঊর্মি—মানে, মিলি সেন কী করলেন তারপর?

সেলিম বলল—সেটাই তো ধাঁধা। ঘোড়া ছুটিয়ে তক্ষুণি সে পালিয়ে যায়। যদি এমন হয় যে রূপেশকুমারের কোন শত্রু নকল রিভলভারটার বদলে গুলিভরা আসল রিভলবার রেখে দিয়েছিল যথাস্থানে এবং তা না জেনে মিলি সেন ব্যবহার করেছে, তাহলে সে পালাবে কেন? তাই না?

—ঠিক বলেছিস! হতভম্ব হয়ে পড়ত। মূর্চ্ছা যেত। কান্নাকাটি করত।

—রাইট। অথচ সে পালাল। ঘোড়াটা পরে একটা নদীর ধারে পাওয়া যায়। মিলি সেন হাওয়া। ওখানে একটা গ্রাম আছে। গ্রামের একজন লোক বলে যে নদীর ব্রিজের পাশে একটা গাড়ি দাঁড় করানো ছিল। ঘোড়ায় চেপে এক ঔরৎ আসে এবং ঘোড়াটা ছেড়ে দিয়ে গাড়িতে ওঠে। গাড়িটা চলে যায়। তার মানে কেউ অপেক্ষা করছিল সেই গাড়িতে। পুলিস তন্ন-তন্ন চেষ্টা করেও গাড়ি বা তার মালিকের হদিস পায়নি।

শেখর বলল—সব জলের মতো পরিষ্কার হল। মানে সেন্টরহস্য ইজ ক্লিয়ার।

সেলিম বলল—মোটেও না। অবনীদাকে আমাদের আড্ডায় আসতে বলেছি। সময় পাবেন কিনা জানি না। এলে ওর মুখে শুনবি সব। অবশ্য অবনীদা বলছিলেন, ছেড়ে দাও। পুরনো কেস। আর, আমারও ওসব পুলিসকে জানিয়ে এখন নষ্ট করার সময় নেই। মিলিকে নিয়ে আর ঝামেলা বাড়াবো না।

আমি বললুম—আচ্ছা, গুপ্টাসায়েব তো বোম্বেতে ছিলেন শুনেছি। তাহলে কি রূপেশকুমারকে উনিই মিলি সেনকে দিয়ে খুন করিয়েছেন?

রঞ্জন বলল—বাঃ! এটা তো ভাবিনি! ঠিক বলেছিস!

এই সময় আনন্দ এল। —কী রে, খুব জমেছে মনে হচ্ছে! বিষয়টা কী?

রঞ্জন বলল—আবার কী? মিলি সেন।

—সে আবার কে?

—তোদের ঊর্মিমালা গুপ্টা!

সেলিম রঞ্জনের দিকে চোখ টিপে বলল—আনন্দ, তোর বস কোথায় গেল রে একটু আগে?

আনন্দ বলল—দানিয়েল সায়েবের বাগানবাড়ি।

—সে তো একুশে মার্চ যাবার কথা!

—উঁহু। ডেট এগিয়ে দিয়েছে।

—পার্টি দেবে বলছিল যে ?

—জানি না। গুপ্টার সবই গুপ্ত ব্যাপার।

আমি বললুম—ভ্যাট্, ওইভাবে হঠাৎ চলে যাবে কী? জিনিস পত্তর যাবে না ?

—যাবে। ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা হয়ে আছে। আমি লরীতে ক্যামাক স্ট্রীটের মালপত্তর নিয়ে যাব।

—আজই ?

—হ্যাঁঃ। সব ব্যবস্থা করা আছে।

—আগে বলিসনি তো ?

আনন্দ চটে গিয়ে বলল—যা বাবা! আমিও কি জানতুম নাকি! আজই দুপুরে হঠাৎ ডেকে সব বললেন। ট্রান্সপোর্টে ফোন করে নিজেই ব্যবস্থা করলেন। আর তোদেরও শালা খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই। যতসব আজেবাজে ব্যাপারে নাক গলাতে যাস্। এই আপার ক্লাস লোকগুলো আজকাল কী হয়েছে, জেনেও ন্যাকামি করিস। কই শেখর, সিগ্রেট দে। এক্ষুনি বেরোতে হবে।

তিন

বিজনের বিবৃতি

এয়ারকণ্ডিশনড ঘর ছাড়া যে মেয়ের নাকি ঘুম হয় না, সে দানিয়েল কুঠিতে রাত কাটাবে কেমন করে? ইলেকট্রিক লাইন কবে ওখানে কাটা গেছে, আর দেওয়া হয়নি জানতুম। এবার নিশ্চয় শিগ্‌গির নেওয়া হবে। কিন্তু ততদিন শ্রীমতী ঊর্মির রাত কাটবে কেমন করে?

আমরা এসব জল্পন-কল্পনা করেছিলুম। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, অমন হুট করে কলকাতা ছেড়ে ওখানে চলে গেলেন কেন? এর সঙ্গে সেলিমের সেই অবনীদার কলকাতা আসার কোন যোগাযোগ নেই তো?

পরদিন দুপুরে সেলিম পরিচালক ভদ্রলোককে নিয়ে এল। নামী মানুষ ফিল্ম জগতের। ছবি দেখা ছিল, প্রত্যক্ষ দেখলাম এতদিনে। ভারি অমায়িক আর ভদ্র। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। মাথায় টাক রয়েছে। ফরসা ধবধবে গায়ের রঙ। বাংলা উচ্চারণে সামান্য টান আছে, দীর্ঘকাল প্রবাসে অবাঙালীদের সঙ্গে কথা বলার পর এ টানটা থাকা খুবই স্বাভাবিক। পুরো নাম অবনী ভরদ্বাজ।

আলাপ হওয়ার পর আমারা হিন্দি বনাম বাংলা ছবি নিয়ে খুব জমিয়ে তুললুম। কিন্তু আসল প্রশ্নটা মনে যতই তীব্র হোক, মুখে আসতে প্রত্যেকেরই বাধছিল। হঠাৎ উনি নিজে থেকেই বললেন—মিঃ প্রকাশ গুপ্টার অফিস তো এ বাড়িতেই আছে?

ঘাড় নাড়লুম। অবনীবাবু আমাদের সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে নিশ্চয় কিছু আঁচ করলেন। তারপর একটু হেসে বললেন—আমার প্রাক্তন হিরোইনের সঙ্গে ইতিমধ্যে আপনাদের আলাপ হয়েছে শুনলুম।

সেলিম বলল—অবনীদা, আপনি প্লিজ ওদের সেই স্যুটিংয়ে মার্ডারের ঘটনাটা বলুন না ! আপনার নিজের মুখে ওরা শুনলে খুশি হবে।

অবনীবাবু হেসে বললেন—খুনখারাপির ঘটনা শুনে খুশি হবেন। বল কি সেলিম ?

সেলিম অপ্রস্তুত হল। শেখর আগ্রহ দেখিয়ে বলল—আপনি বলুন।

সেদিন সেলিম যা-যা বলেছিল, তা ডিটেলস বর্ণনা করে বললেন অবনীবাবু। শেষে বললেন—যাই হোক, এসব ব্যাপারে আমি তখনও জড়িয়ে পড়তে চাইনি, এখনও চাইনে। কারণ বুঝতেই পারছেন যে, এতে আমার কেরিয়ারের পক্ষে অসুবিধের সৃষ্টি হয়। হ্যাঁ, এমন যদি হত যে, মিলি নামকরা নায়িকা ছিল, তাকে নাহলে আমার ছবি চলবে না, কিংবা ধরুন, সেই নবাগত রূপেশকুমার ছেলেটিও কোন সুপারহিট নায়ক ছিল—তাহলে ভিন্ন কথা। অহেতুক এসব স্ক্যাণ্ডাল বাড়তে দিয়ে আমার ক্ষতি করা ছাড়া কিছু হত না।

শেখর বলল—কিন্তু র‍্যাদার হিউম্যান পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে…

ওকে বাধা দিয়ে অবনীবাবু বললেন—মশাই, পৃথিবীতে প্রতিমিনিটে লক্ষ লক্ষ অন্যায় বা খুনখারাপি হচ্ছে। আমি তো ত্রাণকর্তা প্রফেট নই তাছাড়া, কে বলতে পারে যে, রূপেশকুমার মিলি সেনের কিংবা অন্য কারো জীবনে কোন সাংঘাতিক ক্ষতি করেনি ? খুন বড় সহজে মানুষ করে না। আর, আমি তো জজসায়েব নই !

অবনীবাবু একটু গম্ভীর হয়ে থাকার পর ফের আগের মতো সহজ হলেন। বললেন—এনিওয়ে ! আমি বুঝতে পারছি—আপনারা সব ব্যাচেলার ইয়ং ম্যান—আপনাদের কাছে এটা ভীষণ থ্রিলিং। খুবই স্বাভাবিক তা। আপনারা আসলে তাজ্জব হয়ে গেছেন। কারণ, সত্যি তো, অমন সুন্দর স্ত্রীলোক, তাতে তরুণী, মানুষ খুন করে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। আপনাদের কৌতূহল বা চাঞ্চল্য খুবই স্বাভাবিক।

সেলিম বলল—অবনীদা, মিলি সেন রাতারাতি বারাকপুর বাগান বাড়িতে কেন পালাল, তা কিন্তু আমরা টের পেয়েছি। আপনার ভয়ে

অবনীবাবু বললেন—যাঃ! আমাকে ও জানে। ভয় করে না।

—তাহলে অমন রাতারাতি পালাল কেন?

—মিলির রহস্য আমার জানা নেই। আরও নানা কাণ্ড করা ওর পক্ষে স্বাভাবিক।

—অবনীদা, এক কাজ করা যাক। আপনি আজ বিকেলে একটু সময় করুন না!

—অসম্ভব। অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে একগাদা।

—প্লিজ দাদা! চলুন, আমরা বেড়াতে যাবার ছলে কুঠিবাড়িতে হানা দিই। তারপর দেখি, শ্রীমতী কী করেন!

সেলিম ও বাকি সবাই হেসে উঠলুম। অবনীবাবু বললেন—সেলিমের চ্যাংড়ামি এখনও যায়নি। ছেড়ে দে! খাকোকা বেচারিকে বিব্রত করে কী হবে? লেট হার এনজয় উইথ দা ওল্ড ফেলো।

আমি বললুম—মিঃ গুপ্তাকে আপনি চেনেন না?

অবনীবাবু বললেন—মনে পড়ছে না ঠিক। চিনতে পারি, নাও পারি!

একটু পরে অবনীদা চলে গেলেন। সেলিম ওঁকে বিদায় দিতে নেমে গেল। তারপর ফিরে এসে বলল—অবনীদা অদ্ভুত মানুষ! এমন নির্লিপ্ত আর উদাসীন লোক দেখা যায় না। বিজু, আমার মাথায় চন্ত কটকট করে পোকা কামড়াচ্ছে!

শেখর নিজের মাথায় টোকা মেরে বলল—আমারও।

রঞ্জন বলল—হ্যাঁ, যা বলেছিস!

আমি বললুম—কামড়ানিটা আমারই বেশি। কারণ, মিলি সেন আমাকে ডেকেছিলেন কী জন্যে—বলা হল না। শিগ্‌গির ওঁর কথাটা না শুনলে মাইরি আমি মরে যাব!

সেলিম বলল—তাহলে চল্‌, বেরিয়ে পড়ি। এখন তো ছুটো বাজে। পিকনিকের ছলেই যাই। আমি রনুকে ফোনে বলে দিচ্ছি, ইদ্রিস সায়েবকে বলবে এবং ঘরের চাবিটা নিয়ে যাবে ওখানে।

শেখর বলল—ও কে। আয়, আমি ডায়াল করে দিচ্ছি। নাম্বার বল্‌।

রন্নুকে ওখানে চাবি নিয়ে অপেক্ষা করতে বলে আমরা বেরোলুম। রান্নার সরঞ্জাম সব ওখানেই মিলবে। শুধু চাল-ডাল মসলাপাতি সঙ্গে নিতে হবে। নিউ মার্কেটে গিয়ে জাঁকজমকের সঙ্গে মাংস ইত্যাদি কেনা হল। তারপর সব জিনিসপত্র ভাগাভাগি করে নিজের নিজের ব্যাগে নিয়ে আমরা রওনা দিলুম। পথে হুইস্কির বোতল নেওয়া হল গোটা তিন। ট্যাক্সি বি টি রোডে গিয়ে উঠলে শেখর মনের আনন্দে গান জুড়ে দিল।

ব্যারাকপুর পৌঁছতে তখন সূর্য প্রায় ডুবছে। দানিয়েল সায়েবের বাড়ির গায়ে ইতিমধ্যে সন্ধ্যার ধূসরতা ঘনিয়ে উঠেছে। গাছপালায় পাখিরা তুমুল চেঁচামেচি করছে। গেটের কাছে রন্নু চাবি নিয়ে অপেক্ষা করছিল। ও মোটর সাইকেলে এসেছে। এক্ষুনি চলে যাবে। ও নিজে এসে দরজা না খুলে দিলে গোঁয়ারগোবিন্দ বাহাদুর ঝামেলা বাধাবে কি না। অবশ্য ওর দোষ নেই। ইদ্রিস খানের সবসময় ভয় আবার কেউ এসে জবরদখল না করে ফেলে। তাই কড়াকড়ি বলা আছে। তাছাড়া আজকাল প্রতিদিন উনি আর আগের মতো রাত্রিবাস করতে আসেন না। কলকাতাতেই থেকে যান।

রন্নু এসব জানিয়ে চলে গেল। ওর কাছে মিঃ গুপ্টার খবরও পেলুম। বাড়ির উত্তরের অংশ এখন ওঁর দখলে। মাঝামাঝি বাড়িটা দু'ভাগ করা। মাঝের দেয়ালে কোন জানালা না থাকায় ওপাশের ঘরগুলোর টুঁ শব্দটিও এপাশে শোনা যায় না। হ্যাঁ, গুপ্টাসায়েব গতকাল থেকে আজ সারাদিনই এখানে রয়েছেন। আমরা পিকনিক করতে আসছি, তাও শুনেছেন রন্নুর কাছে।

আমরা দক্ষিণের গেটে থাকায় গুপ্টাসায়েব বা শ্রীমতী উর্মিকে দেখার আশা ছিল না। তবে বাইরে বেড়াতে বেরোলে দেখা পেতুম।

দরজা খুলে জিনিসপত্র রাখা হল। বাহাদুর এল হাসিমুখে। শেখর জিগ্যেস করল—কী বাহাদুর, কেমন আছ?

বাহাদুর ঘাড় নাড়ল মাত্র। ভাল আছে।

—ভূত দেখতে পাচ্ছ তো বাহাদুর?

বাহাদুর তাতেও ঘাড় নাড়ল। পাচ্ছে কিংবা পাচ্ছে না।

আমি বললুম—পাশের ঘরের সায়েব মেমসায়েবের খবর কী বাহাদুর?

বাহাদুর আবার ঘাড় নাড়ল। ভালই আছেন। না থাকার কী আছে!

—এক বালতি জল চাই, বাহাদুর!

বাহাদুর জলের বালতিটা নিয়ে রাস্তার দিকে টিউবেলে চলে গেলে সেলিম বলল—প্রতিবেশীরা একেবারে সাইলেণ্ট ডেড! ব্যাপার কী? গুপ্টাও তো এল না রে! টের পায়নি মনে হচ্ছে! আয়, কোরাসে গান জুড়ে দিই।

শেখর গম্ভীর মুখে বলল—থাম্। আগে ছিপি খুলি।

চারটে গ্লাস পাশের কিচেন থেকে এনে রীতিমতো সেলিব্রেট করা হল। তারপর আমরা কোরাস গান জুড়ে দিলুম। গানটা লিখেছিল রঞ্জন, সুর শেখরের। খুব প্রিয় গান আমাদের।

দারা দিরি দারা দিরি দ্রাঁও দ্রাঁও তুমুম্বা
ট্র্যাঁও ট্র্যাঁও টিরিটিরি টেরেমেরে লুমুম্বা
হুম হুম হুমা হুমা
গুম গুম গুমা গুমা
চ্যাঁও চটাস চ্যাঁও চটাস
ধড়াস ধড়াস বুক কাবুক টাবুক কুক হুড়ম্বা
এ্যাঁও তুমুম্বা লুমুম্বা……
লারা লিরি হো
দারা দিরি হো·· হোঃ হোঃ হোঃ ॥

বাহাদুর বালতিভরা জল মেঝেয় রেখে হাঁ। বাবুরা বেদম নাচছেন তখন। এই নাচ খাঁটি তাহিতি দ্বীপপুঞ্জের, তা কি বেচারা জানে? ঘরে তখন বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। আমরা চালিয়ে গেলুম। পুরনো বাড়িটা ভূতুড়ে নাচগানে কেঁপে কেঁপে উঠতে থাকল। আক্ষেপ

হচ্ছিল, একটা গিটার আনলে ভাল হত। সেলিম ভাল বাজায়।

এক সময় বাহাদুর বলল—আলো, সাব!

হ্যাঁ, আলো জ্বালা উচিত এবার। এখন কৃষ্ণপক্ষ চলছে। বাইরে অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে। মোমবাতি বের করে জ্বালা হল। তারপর বাহাদুর চলে গেল। দরকার হলে তাকে ডাকা যাবে আবার।

কিচেনে একটা মোমবাতি নিয়ে গেল সেলিম আর রঞ্জন। আমি আর শেখর মালমসলার প্যাকেট বয়ে রেখে এলুম। সেলিম রাঁধবে। আমরা সব ঠিকঠাক করে দেব। এ ঘরটা বিরাট। ফায়ার প্লেসও আছে। ডানদিকে বাথরুম। ভিতরে আরও অনেকগুলো ঘর। মোমবাতি হাতে আমি আর শেখর সব দেখে এলুম চোর এসে লুকিয়ে আছে নাকি। কেন থাকবে? চুরি করার কীই বা আছে? আসলে আমরা প্রতিবেশীদের কোন সাড়া পাওয়ার মতো ছেঁদা খুঁজছিলুম। দেয়াল একেবারে নিরেট। ফাটলও নেই।

কিচেনটাও বিশাল। ডাইনিং ঘরের সংলগ্ন সেটা। কিন্তু ডাইনিং ঘর এখন আর বলা যাবে না। একেবারে ফাঁকা। সদর দরজা বন্ধ করে সেখানে আমরা মেঝেয় শতরঞ্জি বিছিয়ে বসলুম। দরজা দিয়ে সেলিমকে কুকারের সামনে রান্নায় ব্যস্ত দেখতে পাচ্ছিলুম। মদ্যপান টুকটাক চলছে চারজনের। রঞ্জন সেলিমকে খাইয়ে দিয়ে আসছে। মাঝে আমরা গান গাইছি, নাচছিও। কিন্তু গুপ্টা-দম্পতির কোন সাড়া নেই। প্রতিমুহূর্তেই আশা করি ওঁরা কেউ এসে আমাদের দরজায় কড়া নাড়বেন। কিন্তু না, সে আশা যেন নেই-ই।

ফলে উৎসাহ লম্ফঝম্প ক্রমশঃ মিইয়ে পড়ছিল। এক সময় রঞ্জন বলল—গুপ্টার হল কী রে? একবারও যে টিকি দেখায় না!

শেখর গম্ভীরভাবে বলল—বউ নিয়ে শুয়ে আছে।

—বিজু! রঞ্জন ডাকল।—আয় না, একবার ওদিকটায় ঘুরে দেখে আসি!

উঠে পড়লুম। শেখরকে দেখলুম অমনি সেলিমের কাছে গিয়ে বসল। বাইরে ঘন অন্ধকার। দূরে রাস্তার ধারের আলোগুলো

গাছের আড়ালে ঝিকমিক করছে। হাওয়া দিচ্ছে জোর। গাছের ফাঁকে গঙ্গার বুকেও আলো দেখা যাচ্ছে। এদিকটা সুনসাম নির্জন। মাঝেমাঝে রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলার গরগর শব্দ শোনা যাচ্ছে।

আমরা সিগ্রেট টানতে টানতে বাগান ঘুরে উত্তরদিকে গেলুম। অবাক হয়ে দেখলুম, গুপ্টার দিকটা ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। দরজা-জানালার ফাঁক দিয়েও কোন আলো আসছে না। এই সন্ধ্যাবেলায় শুয়ে পড়ল নাকি ওরা?

যা আছে বরাতে বলে সেদিকে এগিয়ে গেলুম। এতক্ষণে মনে পড়ল, টর্চ আনা হয়নি। কী আর করা যাবে!

পা টিপে ধাপবন্দী বারান্দায় উঠে বুক টিপটিপ করতে থাকল। রঞ্জন আর চুপ করে থাকতে পারল না। একবার কেশে ডাকল—মিঃ গুপ্টা আছেন নাকি?

কোন সাড়া এল না। তখন আমি ডাকলুম—মিঃ গুপ্টা! মিঃ গুপ্টা আছেন?

তবু কোন সাড়া নেই। এবার দরজার সামনে দেশলাই জ্বাললুম। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ! পর্দা তুলতেই সেটা বোঝা গেল। সেই সময় সেদিনকার সেই কড়া সেন্টের গন্ধ নাকে এল।

আশ্চর্য তো! এই সবে সাড়ে সাতটা বাজে। এরই মধ্যে বেঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে ওরা? দরজায় ধাক্কা দিলুম আস্তে। ব্যাপারটা খুব অস্বাভাবিক লাগছিল।

অমনি দরজাটা ফাঁক হয়ে গেল। কেন কে জানে, অজ্ঞাত ভয়ে দু'জনেরই বুক কেঁপে উঠল। রঞ্জন ফিসফিস করে বলল, দরজা খোলা কেন রে?

দরজাটা ঠেলে মরিয়া হয়ে ভিতরে ঢুকে গেলুম আমরা। তারপর আবার দেশলাই জ্বাললুম! ঘরটা বড়। এরি মধ্যে বেশ সাজানো হয়েছে। আলমারি হোয়াটনট সেলফ সোফাসেট রয়েছে। সামনে দিকে ভিতরের দরজাতেও পর্দা তুলে ভিতরে গেলুম দু'জনে। সঙ্গে সঙ্গে একরাশ তেজী সুগন্ধ আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এসে।

ফের দেশলাই জ্বালাতেই যা নজরে পড়ল, আমাদের দুজনের গলায় একই সঙ্গে অস্ফুট একটা আওয়াজ বের করার পক্ষে যথেষ্টই। মেঝেয় মিঃ গুপ্টা উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছেন। পিঠের দিকে চাপচাপ রক্ত। আর ঊর্মি ওরফে মিলি সেন বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে আছে।

আবার দেশলাই জ্বেলে ব্যাপারটা দেখে নিয়ে আমরা দুজনে দৌড়ে বেরিয়ে এলুম। বিভ্রান্ত হয়ে চেঁচাতে থাকলুম—সেলিম! শেখর! বাহাদুর!

শেখরের সাড়া পাওয়া গেল প্রথমে। তারপর সেলিমের। বাহাদুর একটা হারিকেন হাতে দক্ষিণ-পূর্ব কোণের একতালা ঘর থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল। লোকটা অদ্ভুত। সে যেন একজন পাথরের মানুষ।...

চার

কর্ণেল নীলাদ্রি সরকার

টেবিলের একদিকে বিজন, রঞ্জন, শেখর ও সেলিম বসেছে, অন্যদিকে অবসরপ্রাপ্ত কর্ণেল নীলাদ্রি সরকার বা এন. এস. বসেছেন। বয়স ষাটের কোঠায়। মুখে সাদা গোঁফদাড়ি, মাথায় টাক, হাসিখুশি বুড়ো মানুষটির খ্যাতি অপরাধতাত্ত্বিক হিসেবে প্রচুর।

তাঁর ইলিয়ট রোডের বাসায় বসে বিজন বিবৃতি দিচ্ছিল। একই বিবৃতি পুলিসকেও সে দিয়েছে। দানিয়েল কুঠির জোড়া খুনের কিনারা এখনও করতে পারেনি পুলিস। এমনকি চোরের কাণ্ড বলে চালানোর চেষ্টাও চলছে। সত্যি তো! চোর-ডাকাত ছাড়া আর কে খুন করবে গুপ্টাদম্পতিকে? কী চুরি হয়েছে, সেটা বলা কঠিন। আপাতদৃষ্টে তেমন কোন প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না। ঊর্মি গহনা পরতেন সামান্যই। শুধু গলায় একটা দামী পাথরের হার ছিল, তা চোর নেয়নি। কানে বা হাতে যা সোনা ছিল, তাও ঠিকঠাক আছে।

আজকাল এত বেশি মানুষ খুন হয় যে পুলিশ তেমন আর গা করে না। নাক গলিয়ে অহেতুক ঝামেলা বরদাস্ত করতে চায় না তারা। কাজেই গুপ্টাদম্পতির হত্যাকাণ্ডের কিনারা বেশিদূর এগোয়নি।

কর্ণেল মন দিয়ে শুনছিলেন বিজনের স্টেটমেণ্ট। বিজন থামলে এবার বললেন—ঊর্মি বা মিলি সেনের ব্যাকগ্রাউণ্ড জানা থাকলে খুনের কিনারা হত, এ বিষয়ে আমি আপনাদের সঙ্গে একমত ইয়ং ফ্রেণ্ডস! কিন্তু পুলিসকে আজকাল কাজ করতে হলে প্রভাবশালী লোক কিংবা গোষ্ঠীর দরকার হয়।...বলে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে সকৌতুকে হেসে উঠলেন।

কর্ণেলকে যাঁরা চেনেন, তাঁরাই জানেন—মানুষটি মোটেও

বদমেজাজী গোমড়ামুখো গোয়েন্দা নন। যেমন খামখেয়ালী, তেমনি মিশুক আর কৌতুকপরায়ণ। বিশেষ করে একালের যুবকযুবতীদের সঙ্গে চমৎকার মিশে যেতে পারেন।

বিজন বলল—কর্ণেল, আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু এ খুনের ব্যাপারে আমরা চারজনে এক অদ্ভুত অবস্থায় পড়েছি। মোটেও এটা বরদাস্ত করতে পারছি না যে আমাদের নাকের ডগায় এমন সাংঘাতিক কাণ্ড করে কেউ নিরাপদে কেটে পড়বে আর আমরা কিচ্ছু করতে পারব না।

শেখর বলল—রিয়্যালি কর্ণেল! একটা কিছু না করলে আমাদের ভীষণ কষ্ট হবে।

রঞ্জন ও সেলিমও সায় দিল।—হ্যাঁ, ভীষণ কষ্ট পাব।

কর্ণেল সকৌতুকে বললেন—আপনাদের বয়সের পক্ষে নিশ্চয় সেটা স্বাভাবিক। যৌবনের মূল্য যৌবন ছাড়া কেউ বুঝতে পারে না। তাছাড়া উর্মি দেবীর সেই দামী সেন্টও সম্ভবতঃ একটা হিপ্নোটিক ব্যাপার —তাই না? আপনারা হিপ্নোটাইজড্ হয়ে পড়বেন, তাও কিছু দোষের নয়। আই এগ্রি! ইতিহাসে ও পুরাণে সুন্দরীদের জন্যে অনেক বড় যুদ্ধ হয়ে গেছে!

বলে ফের হো হো করে হেসে উঠলেন। এ সময় তাঁর আত্মীয়া ও পরিচারিকা মিসেস্ অ্যারাথুন ট্রেতে চা ইত্যাদি রেখে গেলেন। সবাই কাপ তুলে নিল। নিঃশব্দে কিছুক্ষণ চা খাওয়ার পর কর্ণেল হঠাৎ বললেন—আচ্ছা বিজনবাবু, সেই সন্ধ্যা রাত্রে আপনারা কেউ কোন অস্বাভাবিক বা দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো কিছু লক্ষ্য করেছিলেন কি? বেশ ভেবে বললেন কিন্তু। যত তুচ্ছ হোক, এমন কোন ব্যাপার নজরে পড়েছিল?

বিজন একটু ভেবে বলল—কই, তেমন কিছু তো……নাঃ। দেখিনি।

রঞ্জন বলল—আমিও দেখিনি।

শেখর বলল—কই? আমার চোখে কিছু পড়েনি।

সেলিম বলল—না!

কর্ণেল একটু হেসে বললেন—আপনারা প্রত্যেকেই কিন্তু ঠিক কথা বলছেন না ভাই!

ওরা চমকে উঠল। বিজন বলল—কেন কেন কর্ণেল?

—আপনাদের স্টেটমেণ্ট কিন্তু ভিন্ন কথা বলছে। আপনারা প্রত্যেকেই অন্ততঃ একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলেন!

ওরা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। সেলিম অস্ফুট স্বরে বলল—অস্বাভাবিক ব্যাপার!

—হ্যাঁ। মিঃ এবং মিসেস্ গুপ্টার সঙ্গে আপনাদের অন্তরঙ্গতা হয়েছিল। আপনারা যখন কুঠিবাড়িতে গেলেন, আশা করেছিলেন—ওঁরা আপনাদের হইহল্লা শুনে বেরিয়ে এসে আপনাদের সঙ্গে আড্ডা দেবেন। আপনারা পৌঁছান সন্ধ্যা পৌনে ছটা নাগাদ। তারপর অত কাণ্ড হল, ওঁরা কেউ এলেন না। এটা আপনাদের অস্বাভাবিক লেগেছিল। তাই না?

এবার সবাই হইচই করে বলল—ঠিক, ঠিক। ঠিকই তো!

—এবং সেজন্যেই বিজনবাবু ও রঞ্জনবাবু ওঁদের ঘরে গিয়ে হানা দেন!

বিজন বলল—সেটা তো বলেইছি। এছাড়া কিছু অস্বাভাবিক তো দেখিনি।

কর্ণেল হাসলেন।—ওকে, ফ্রেণ্ডস। তাহলে এবার আমাদের সভা ভঙ্গ হোক। আপনাদের প্রয়োজন আমার নিশ্চয় হবে, তখন ডাকব। আপাততঃ আমি পুলিসের সঙ্গে যোগাযোগ করে দেখি, ওঁরা কী বলেন।

ওরা উঠে দাঁড়াল। সেলিম হতাশ মুখে বলল—পুলিশ কিচ্ছু করবে না কর্ণেল!

কর্ণেল সে বিষয়ে কোন মন্তব্য না করে হঠাৎ বললেন—আচ্ছা মিঃ সেলিম, আপনার সেই অবনীদা ভদ্রলোক কি এখনও আছেন কলকাতায়?

সেলিম বলল—না। ঘটনার পরদিন অর্থাৎ গতকাল দুপুরের ফ্লাইটে বোম্বে চলে গেছেন শুনেছি। কুঠিবাড়ি থেকে ফিরে ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে চেষ্টা করেছিলুম। হয়নি। ভীষণ ব্যস্ত মানুষ তো! হোটেল ছেড়ে এক বন্ধুর বাসায় উঠেছিলেন। ঠিকানা যোগাড় করে গেলুম, বেরিয়ে গেছেন ওখান থেকে! তারপর কাল দুপুরে ফোন করলুম—বলল, রওনা হয়ে গেছেন।

কর্নেল বললেন—হুম! আচ্ছা, আপাততঃ এই।

ওরা বেরিয়ে গেলে কর্নেল কিছুক্ষণ জানলার কাছে দাঁড়িয়ে থাকলেন। সেই সময় ফোন বেজে উঠল। এগিয়ে এসে রিসিভার তুললেন। —হ্যাল্লো, এন. এস. বলছি। আরে, জয়ন্ত নাকি? মেঘ না চাইতেই জল। আশ্চর্য যোগাযোগ বটে। এক্ষুনি তোমাকে রিঙ করব ভাবছিলুম।

—কর্নেল, আমি বিপন্ন।

—জয়ন্ত, তুমি কি দানিয়েল কুঠির মার্ডার কেসের ব্যাপারে কথা বলছ?

—আশ্চর্য কর্নেল, আশ্চর্য!

—কেন?

—আপনি নিশ্চয় টেলিপ্যাথি জানেন।

—নিছক দৈবাৎ যোগাযোগ বলতে পারো।

—যাক্‌গে, শুনুন। আপনি কেসটার কতখানি জানেন, জানি না। গত রাত্রে হঠাৎ কেসটা বারাকপুর পুলিস লালবাজার ডিটেকটিভ ডিপার্টে পেশ করেছে। কারণ…

—কারণ মর্গের রিপোর্টে অস্বাভাবিক কিছু পাওয়া গেছে। কেসটা বার্গ্‌লারি নয়।

—আশ্চর্য, কর্নেল!

—একটু কম আশ্চর্য হওয়া ভাল, জয়ন্ত।

—আমি আসছি, কর্নেল। পনের মিনিটের মধ্যেই।

—এসো।……

কর্ণেল একটু হেসে ফোন রাখলেন। আজকের সকালটা বেশ চমৎকার ছিল। সব গুলিয়ে গেল। আসলে সেই চিরকালের ধুরন্ধর হত্যাকারীটি তাঁকে নিয়ে অদ্ভুত খেলা করে চলেছে। একটি নির্মল বিশুদ্ধ সময়ের অংশও সে হত্যার রক্ত ছড়িয়ে লাল না করে ছাড়বে না। বয়স এদিকে বেড়ে যাচ্ছে। এই খেলায় জড়িয়ে পড়তে আর ইচ্ছে করে না। অথচ ক্রমশঃ মানুষের জীবন এত মূল্যবান মনে হয়ে উঠছে যে জীবনবিরোধী ওই হন্তারক শক্তির বিরুদ্ধে লড়ে যেতে ইচ্ছে করছে ক্লান্তিহীনভাবে। এমন কোন সমাজ কি সম্ভব, যেখানে মানুষের এই ভয়ংকর বৃত্তিটা লোপ পাবে? হননবৃত্তি যেন প্রকৃতির একটা আইন, যার নাম আমরা দিয়েছি পশুত্ব।

কিন্তু দেবত্ব বলেও একটা আইনকানুন প্রকৃতি মানুষের জন্য দিয়েছেন। পশুত্বের সঙ্গে তার লড়াই চলেছে আবহমানকাল ধরে। খ্রীষ্টানিটিতে এই পশুত্বকেই বলা হয়েছে শয়তান। শয়তান অজয় অমর।......

ঘণ্টা বাজল বাইরের ঘরের দরজায়। মিসেস্ অ্যারাথুনের গোলাপী গাউনের কিছু অংশ পর্দার ফাঁকে দেখা গেল। কর্ণেল অন্যমনস্কভাবে বুকে ক্রস আঁকলেন।

গোয়েন্দা বিভাগের এ সি. জয়ন্ত ব্যানার্জির সাড়া পাওয়া গেল। —হ্যাল্লো ওল্ড বস!

—এস জয়ন্ত। তোমার ওই ফাইলটা দেখে অস্বস্তি হচ্ছে কিন্তু।

জয়ন্ত তরুণ অফিসার। সে গোয়েন্দা বিভাগের অন্য অফিসারদের মতো গোমড়ামুখো নয়। প্রচণ্ড হাসতে পারে। কর্ণেলের সঙ্গে কৌতুকে ও হাসিতে সে ছাড়া আর কেউ পাল্লা দিতে পারে না। সে বসে ফাইলটা রাখল। তারপর কপালের ঘাম মুছে বলল—অস্বস্তি হবেই। কারণ কে কবে শুনেছে যে ভিকটিমের দেহ খুবলে হত্যাকারী মাংস তুলে খেয়েছে!

—খেয়েছে! বল কী জয়ন্ত?

—তাছাড়া কী? দানিয়েল কুঠির কেসটা চুরিচামারি বলেই মনে

করা হচ্ছিল। লাস দুটোর গায়ে মারাত্মক ক্ষত চিহ্ন, মেঝেয় রক্ত। দেখলে মনে হয়, ছোরাটোরা মারা হয়েছে। অথচ মর্গের রিপোর্টে বলছে —মোটেও তেমন কিছু নয়। মারাত্মক বিষ পটাসিয়াম সাইনায়েডই মৃত্যুর কারণ। গুপ্টা দম্পতির হাতের কাছে ছোট্ট টেবিলে মদের বোতল ছিল। গ্লাস দুটো মেঝেয় পড়ে ছিল—দুটোই ভেঙে গেছে। একটা গ্লাসের টুকরোয় লিপস্টিকের দাগ পাওয়া গেছে। তার মানে দুজনে মদের গ্লাসে চুমুক দিয়েই বিষক্রিয়ার ফলে ঢলে পড়ে। এবার অদ্ভুত ব্যাপার হল, মারা যাবার আন্দাজ ঘণ্টা দুই পরে কেউ মিঃ গুপ্টার পিঠ কোন ধারাল কিছুতে খুবলে মাংস তুলেছে। বিছানায় ঊর্মি গুপ্টার লাসটা কিন্তু যত্ন করে শোয়ানো ছিল। বিষক্রিয়ার পরে ওভাবে সটান চমৎকার শুয়ে থাকা সম্ভব নয় কারো পক্ষে। তারপর কেউ ওঁর বুকের কাপড় সরিয়ে একইভাবে কিছু কিছু মাংস খুবলে নিয়েছে। কিন্তু কুঠির সমস্ত ঘর তন্নতন্ন করে দেখা হয়েছে আজ সকালে— ফোরেনসিক এক্সপার্ট টিম ওখানে এখনও রয়েছেন। ফোনে জানলাম, আর কোথাও এক ছিটে রক্ত ওঁদের নজরে পড়েনি। কোন রকম ক্লু ওঁরা পাচ্ছেন না। কুকুর স্কোয়াডও কোন সুবিধে করতে পারেনি। শুধু বোঝা গেছে যে খুনী বাইরে থেকে এসেছিল।

—ভাঙা গেলাস দুটোয় তাহলে সায়নায়েড পাওয়া গেছে ?

—হ্যাঁ।

—মৃত্যুর সময় ঠিক করতে পেরেছেন ডাক্তাররা ?

—বিকেল পাঁচটার কাছাকাছি। তার আগে নয় এবং ছ'টার পরেও নয়! তারপর মাংস খুবলে নেওয়া হয়েছে সাড়ে সাতটার মধ্যেই। কারণ···

—পারুল অ্যাডভারটাইজার্সের ছেলেরা ঠিক সাড়ে সাতটায় লাস দুটো আবিষ্কার করে!

—সে কী! আপনি কেমন করে জানলেন ?

—জানি। পরে বলব'খন। আর কী ফ্যাক্ট আছে, বলো জয়ন্ত।

—ফ্যাক্ট আপাততঃ কিচ্ছু হাতে নেই। সব দিকে যোগাযোগের

ব্যবস্থা করা হয়েছে। দুপুরের মধ্যে গুপ্টা ফ্যামিলির ব্যাকগ্রাউণ্ড পেয়ে যাব, আশা করছি।

—এবার বলো, আমি কী করতে পারি?

—আপনি আমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ুন কর্ণেল, প্লীজ!

কর্ণেল একটু ভেবে নিয়ে বললেন—কেসটা বেশ ইন্টারেস্টিং। ঠিক আছে, চলো—বেরিয়ে পড়া যাক্। ইয়ে—ব্যারাকপুর যাচ্ছি আমরা, তাই না?

—হ্যাঁ কর্ণেল। আপনারই থিওরি—হত্যাকাণ্ডের জায়গাটাই হত্যাকারীকে সনাক্ত করে।...

সারা পথ আর মুখ খুললেন না কর্ণেল নীলাদ্রি সরকার। চুরুটও খেলেন না অভ্যাসমতো, গম্ভীর হয়ে বসে থাকলেন। গভীর চিন্তায় মাঝে মাঝে এমনভাবে ওঁকে ডুবে যেতে দেখেছে জয়ন্ত ব্যানার্জি। এসময় ডাকলে সাড়া পাওয়া যায় না।

দানিয়েল কুঠির সামনে কিছু পুলিস ছিল। উত্তরের বারান্দায় ফোরেনসিকের লোকেরা ফিতে দিয়ে মাপজোক করছিলেন। দু'জনে কাছে যেতেই ওঁরা কাজ থামিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। জয়ন্ত পরিচয় করিয়ে দেবার আগেই কর্ণেল তাঁর সমবয়সী একজনের দিকে হাত বাড়িয়ে বলে উঠলেন—হ্যালো, হ্যালো! ডাঃ পট্টনায়ক যে!

—কর্ণেল সরকার! আপনাকেও তাহলে পাকড়াও করা হল!

ফোরেনসিক বিশেষজ্ঞ ডাঃ সীতানাথ পট্টনায়ক জড়িয়ে ধরলেন কর্ণেলকে। তারপর কর্ণেল বললেন—আপনাদের কাজের ব্যাঘাত ঘটালাম নিশ্চয়, ডাঃ পট্টনায়ক?

—মোটেও না। আসলে কী জানেন? ফ্যাক্টস একটা মার্ডারের কেসের পক্ষে মুখ্য উপাদান। কিন্তু ফ্যাক্টস থেকে ডিডাকসান করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছানোটাই হল কৃতিত্বের পরিচয়। ডিডাকশানের বোধ তো অনেকের থাকে না। একই ফ্যাক্টস থেকে একজন

একরকম সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন, আরেকজন তার উল্টোও যেতে পারেন। এসব ব্যাপারে আপনার কৃতিত্ব অস্বীকার করে কে? ইউ আর ওয়েলকাম, কর্ণেল সরকার।

জয়ন্ত, কর্ণেল আর ডাঃ পট্টনায়ক এবার ভিতরে ঢুকলেন। প্রথমে বসার ঘর। বেশ বড়। যথারীতি ফায়ার প্লেস আছে। সেকালে ইউরোপীয়রা এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশেও স্বদেশের পরিবেশ তৈরী করে বাস করতেন। জানালাগুলো এমনভাবে তৈরী যে বন্ধ করে দিলে ঘর ঘন অন্ধকার হয়ে যায়। এখন সব খোলা ছিল। ঘরে আলো ছিল যথেষ্ট। কর্ণেল ঘরের ভিতরটা দেখছেন লক্ষ্য করে, জয়ন্ত বলল—এ ঘরে নয় কর্ণেল। খুন হয়েছিল ওই পাশের ঘরে—বেডরুমে।

—এক মিনিট। বলে কর্ণেল এগিয়ে গেলেন সোফা সেটটার দিকে। তারপর একটা কিছু লক্ষ্য করে বললেন—ঘরের কোন কিছু আশা করি নাড়াচাড়া করা হয়নি।

—মোটেও না। সব ঠিকঠাক আছে।

কর্ণেল হাঁটু দুমড়ে সোফার নীচের দিকটা দেখতে থাকলেন। তারপর বললেন—দারোয়ান বাহাদুর আর তার বউ তো দক্ষিণের পাঁচিলের কাছে থাকে?

—হ্যাঁ।

—এখানে আসার পর কেউ মিঃ গুপ্টার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল কিনা বলেনি? নিশ্চয় তাদের স্টেটমেণ্ট নেওয়া হয়েছে?

—হয়েছে। কাকেও আসতে দেখেনি ওরা।

—এলেও ওদের চোখে পড়ার কথা নয়!

—কিন্তু গেট তো দক্ষিণে! ওদের ঘরের কাছাকাছি!

—আমি দেখলুম উত্তরের পাঁচিলে একজায়গায় একটা ভাঙা জায়গা রয়েছে। যে কেউ ওপথে এদিকে আসতে পারে। ওরা টের পাবে না।

জয়ন্ত চিন্তিতমুখে বলল—তা পারে!

—আমার মনে হচ্ছে এই সোফাটাই কেউ বসেছিল—যে বাইরের

লোক। কারণ, তার জুতোর তলায় সুরকি গুঁড়ো ছিল।...বলে কর্ণেল পকেট থেকে একটা আতস কাচ বের করে পরীক্ষা করতে থাকলেন।—হুঁউ! তাই বটে। তুমি প্লীজ দেখে এসো তো জয়ন্ত, ওই ভাঙা পাঁচিলের ফাঁক গলিয়ে এলে জুতোর তলায় সুরকি গুঁড়ো লাগে কিনা।

জয়ন্ত বেরিয়ে গেল। ডাঃ পট্টনায়ক বললেন—ওটা আমিও লক্ষ্য করেছি। তবে মিঃ গুপ্টার কর্মচারী আনন্দবাবু আসতে পারেন!

—পারেন। কিন্তু ওইভাবে আসেননি--তা চোখ বুজে বলা যায়। কেন লুকিয়ে আসবেন তিনি? আনন্দবাবুর ব্যাকগ্রাউণ্ডে কিছু আছে বলে মনে হয় না। অন্ততঃ আমার যা শোনাজানা আছে!

ডাঃ পট্টনায়ক একটু হাসলেন। কোন গ্যারান্টি নেই কর্ণেল। সন্দেহ সকলকেই করা উচিত। যে চার বন্ধু খুনের দিনে পিকনিক করেছিলেন বা লাস দেখতে পান, তাঁদেরও সন্দেহের আওতায় রাখা কর্তব্য।

—রাইট, রাইট! বলে কর্ণেল সোফার চারপাশটা ঘুরে দেখতে থাকলেন। সদর দরজা অব্দি মেঝে পরীক্ষা করলেন।

এই সময় জয়ন্ত ফিরে এসে নিজের জুতোর তলায় আঙ্গুল ঘষে বলল—কর্ণেল, ইউ আর কারেক্ট।

কর্ণেল ও ডাঃ পট্টনায়ক পরীক্ষা করে মাথা নাড়লেন। তারপর কর্ণেল হঠাৎ ফায়ার প্লেসের দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর কী একটা কুড়িয়ে নিলেন। ডাকলেন—জয়ন্ত, শোন। এবং আতস কাচে সেটা পরীক্ষা করতে থাকলেন।

জয়ন্ত এগিয়ে গিয়ে বলল—কী ব্যাপার?

—মিঃ গুপ্টা কী ব্র্যাণ্ডের সিগ্রেট খেতেন জানা আছে তোমাদের?

—হ্যাঁ। ব্যারনেস—৪০। বিদেশে রপ্তানী হয়। বেশ দাম আছে।

—কিন্তু এই সিগ্রেটটা সে ব্র্যাণ্ড নয়। এটা ফাইভ স্টার। এও দামী জিন্স।

—ফাইভ স্টার। এ তো ফিল্ম মহলে খুব চালু সিগ্রেট!

—জয়ন্ত, প্লীজ। তোমাকে একটু কষ্ট করতে হবে।

—বলুন না!

—তুমি লোকাল থানা থেকে তোমার অফিসে কনট্যাক্ট করো। অফিসকে বলো এখনই বোম্বে পুলিসকে কনট্যাক্ট করতে। প্রখ্যাত ফিল্ম ডিরেক্টর অবনী ভরদ্বাজের এ ব্যাপারে কিছু বলার থাকতে পারে। ওঁর একটা বিবৃতি চাই। কলকাতা এসে কোথায়-কোথায় গেছেন বা কী করেছেন, সব ওঁর নিজের মুখের কথায় জানা দরকার। তারপর বিবৃতিটা তোমরা ভেরিফাই করবে।

—আসার আগে সে কাজটা করে এসেছি। রাত্রে বিজনবাবু নামে পারুল অ্যাডের সেই ভদ্রলোকের স্টেটমেণ্ট পড়েই আমার সন্দেহ তীব্র হয়েছিল। এই খুনের সঙ্গে ফিল্ম হিরো রূপেশকুমারের খুন হওয়ার কোন যোগসূত্র না থেকে পারে না।

কর্ণেল ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন—চলুন ডাঃ পট্টনায়ক! আমরা এবার বেডরুমে যাই।

বেডরুমটা মাঝারি। শুধু পূবদিকটা ছাড়া জানালায় আলো আসার উপায় নেই। একটা ডবলবেড খাট রয়েছে। চাদর ইত্যাদি সবকিছু ফোরেনসিকের জিম্মায় চলে গেছে। গ্লাসের টুকরো, মদের বোতলটাও। কর্ণেল মেঝেয় হাঁটু দুমড়ে আতাস কাচটা পেতে অদ্ভুত ভঙ্গীতে পরীক্ষা করছিলেন। ডাঃ পট্টনায়েকের ঠোঁটে একটু হাসি দেখা গেল। তিনি বললেন—কর্ণেল কি এ ঘরে সেই সুরকির ধুলো আশা করছেন?

কর্ণেল পাল্টা হেসে বললেন—জানি না।

কিছুক্ষণ পরীক্ষা করার পর তিনি উঠে দাঁড়ালেন। তারপর এগিয়ে সংলগ্ন বাথরুমটা দেখলেন। অব্যবহার্য হয়ে পড়ে ছিল বোঝা যায়। সম্প্রতি সামান্য ব্যবহার করা হয়েছে। কোমোড বেসিন সব ভাঙা। জলের একটা চৌবাচ্চা আছে। সেটা ধুয়ে পরিষ্কার করা হয়েছে কিন্তু জল নেই। জলের পাইপে মরচে ধরে রয়েছে। একটা বড় প্ল্যাস্টিকের

বালতিতে তলায় কিছু জল রয়েছে। সম্ভবতঃ বাইরে থেকে আনা হয়েছে।

এবার বাঁদিকে আরেকটা ঘরে ঢুকলেন। কিচেন কাম ডাইনিং ঘর। তার পাশে স্টোর। স্টোরের ভিতর ঢুকে কর্ণেল বললেন—মাই গুড্‌নেস! ওপাশে জানালাটা ভাঙা যে কেউ বাইরে থেকে ঢুকে পড়তে পারে। কিংবা পালাতে পারে। ডাঃ পট্টনায়ক, এসব ঘরের দরজা কি খোলা ছিল?

—সেটাই তো অদ্ভুত। খোলা ছিল। তার মানে খুনী ওই পথে পালিয়েছে! অবশ্য আমরা কোন সুবকি পাইনি কোথাও! বলে ডাঃ পট্টনায়ক হেসে উঠলেন।

কর্ণেল বললেন—প্রিয় ডাঃ পট্টনায়ক! পটাসিয়াম সাইনায়েড যে দিয়েছে, সেই খুনী কিন্তু। তার অমনভাবে না পালালেও চলত।

—তাহলে কি মাংস খুবলেছে যে, সে আলাদা লোক বলে মনে করেন?

—এখনও আমি কিচ্ছু মনে করি না ডাঃ পট্টনায়ক। শুধু সম্ভাবনার কথাই বলছি। পটাসিয়াম সাইনায়েড মেশানো মদ কিন্তু বোতলে নেই—গ্লাসে পাওয়া গেছে। তার মানে গ্লাস দুটোর তলায় আগে থেকে রাখা ছিল বিষ, অথবা মদ ঢালার পর মেশানো হয়েছে। আগে থেকে রাখার চান্স শয়ে এক। সেটার চেয়ে বরং মদ ঢালবার পর মেশানোটাই সম্ভাব্য।

—তাহলে তৃতীয় একজন ছিল মদ্যপানের সময়।

—রাইট। এবং তার কোন গ্লাস আমরা পাচ্ছি না। অথচ খুনী নিজে মদ না খেলে বিষ মেশানোর চান্স নেবে কীভাবে? এটাই অবাক লাগছে।

—আপনি কি তাহলে বলতে চান যে সেই ফিল্ম ডিরেক্টর ভদ্রলোকও ওদের মদ্যপানের সময় উপস্থিত ছিলেন এবং তিনিই খুনী?

—কিচ্ছু বলতে চাইনি ডাঃ পট্টনায়ক। শুধু সম্ভাবনাগুলো নেড়েচেড়ে দেখছি। তবে একটা ব্যাপার পরিষ্কার যে লোকটি পাঁচিলের

ফোঁকর গলিয়ে এসেছিল, সে ফিল্মের লোক হতেও পারে—চান্স অন্ততঃ সেভেনটি ফাইভ পারসেণ্ট। দুই : সে অসম্ভব ধূর্ত। তাই আসার সময়ই জুতো পরে ঢুকলেও খালি পায়ে বেরিয়েছে—সদর দরজার পথেই হোক কিংবা ওই স্টোরের পিছনকার জানাল গলিয়েই হোক। কারণ, জুতোর সুরকির ছাপ বেডরুমে নেই। আবার, বসবার ঘরের জুতোর ছাপগুলো সব ঘরে ঢোকার, বেরিয়ে যাবার নয়। তিন : সে গুপ্টা দম্পতির সঙ্গে মদ খেতে বসেছিল, তা না হলে বিষ মেশানোর সুযোগ করা খুবই কঠিন। এবং বিষ মেশাতে হলে ওঁদের অন্যমনস্কতা থাকা চাই। আমার ধারণা, এমন সিরিয়াস ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল—যাতে উভয়েই গুপ্টা দম্পতি ভীষণভাবে ইনভলভড। এমনও হতে পারে, একটা গুরুতর জীবনমরণ প্রশ্ন জড়িত ছিল আলোচনায়।

জয়ন্ত বলল—কারেক্ট। আমি একমত।

ডাঃ পট্টনায়ক সন্দিগ্ধভাবে মাথা নেড়ে বললেন—কিন্তু মৃত মানুষকে আঘাত করতে গেল কেন খুনী ?

কর্ণেল বললেন—পুলিসকে বিভ্রান্ত করার জন্য। এটা আজকালকার চুরিডাকাতির ঘটনা বলে চালিয়ে দিতে চেয়েছিল সম্ভবতঃ।

—কিন্তু সে যদি অত ধূর্ত, তাহলে কিছু চুরির নমুনা রাখেনি কেন?

—সময় পায়নি !

—কেন ?

—মনে রাখবেন, ডাক্তারের হিসেবে ওঁদের মৃত্যু হয়েছে সম্ভবতঃ পাচটা থেকে ছ'টার মধ্যে। পাঁচটা পঁয়তাল্লিশে পারুল এ্যাডের ছেলেরা এসে পৌছেছে এখানে। সবদিক বিচার করে আমার অনুমান, ওঁদের মৃত্যু পাঁচটা পঁয়ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে হয়ে থাকবে। তারপর খুনী ডেডবডিতে ছুরি বা ধারালো কিছু চালিয়েছে। কিন্তু চুরির অজুহাত দেখানোর সুযোগ পায়নি বিজনবাবুরা এসে পড়ায়। ওরা খুনীকে দেখতে পেত না। দিব্যি ঊর্মিদেবীর হার বা চুড়ি নিয়ে পালাতে পারত। কিন্তু মনে রাখবেন, খুনের পর খুনীর মানসিক অবস্থা কেমন থাকে। সে একটু শব্দেই তখন চমকে ওঠে।

বিজনবাবুরা হল্লা করে পৌঁছেছিলেন। কাজেই তার তখনই বিভ্রান্ত হয়ে পালানো স্বাভাবিক। অবশ্য, সবই আমার হাইপোথিসিস যাকে বলে।

—কিন্তু তাহলে শেষ অব্দি অবনী ভরদ্বাজই আপনার ধারণা অনুসারে এই কেসের আসামী। আমি অবাক হচ্ছি যে অমন নামী ভদ্রলোক নিজের কেরিয়ার নষ্ট করার চান্স নেবেন এভাবে? এটা উদ্ভট লাগে না কি? নিশ্চয় ওঁর হাতে একগাদা ফিল্মের দায়িত্ব রয়েছে—আর উনি······

কর্ণেল হাত তুলে বললেন—আমরা এখনও সত্যে পৌঁছায়নি ডাঃ পট্টনায়ক। সত্যে পৌঁছাতে হলে অনেক ঘুরপথে যেতে হয়।······

পাঁচ

বেণ্টিক স্ট্রিটের এক ভদ্রলোক

বাগানবাড়ির পাঁচিল ঘেরা মাঠে একটা শিরীষ গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল। কর্ণেল, জয়ন্ত, ডাঃ পট্টনায়ক আর স্থানীয় পুলিস অফিসার হিতেন চক্রবর্তী আলোচনা করছিলেন। কর্ণেল হিতেনবাবুকে প্রশ্ন করছিলেন। এবার জয়ন্তের দিকে ঘুরে বললেন—খুনের দিন তাহলে ইদ্রিস খানের সেই কর্মচারী রনু ছেলেটি এসেছিল বিকেল চারটেয়। তাই না জয়ন্ত?

জয়ন্ত বলল—হ্যাঁ। একটুআধটু এদিকওদিক হতে পারে, তবে চারটের কাছাকাছি বলা যায়।

—রনু দেখা করেছিল মিঃ গুপ্টার সঙ্গে। ইজ ইট?

—হ্যাঁ। মিঃ চক্রবর্তী, ওর স্টেটমেণ্টটা এই ফাইলে আছে। প্লীজ, বের করে ওঁকে দিন না।

হিতেনবাবু ফাইলের নির্দিষ্ট জায়গাটা খুলে কর্ণেলের সামনে ধরলেন। কর্ণেল চোখ বুলিয়ে দেখে নিলেন। তারপর বললেন—হুম! রনুর সঙ্গে বারান্দায় কথা বলেন মিঃ গুপ্টা। তারপর রনু চলে যায় দক্ষিণের পোর্শনে—ওদের ঘরটায়। বিজনদের জন্যে সে অপেক্ষা করতে থাকে। জয়ন্ত, আমি ছেলেটির সঙ্গে মুখোমুখি কথা বলতে চাই।

—তাকে এখন এখানে পাবেন কোথায়?

হিতেনবাবু বললেন—না স্যার। রনু আর ইদ্রিস সায়েব সকালে এসেছেন। চলুন, দেখা হয়ে যাবে।

মাঠ ঘুরে আগাছার জঙ্গল পেরিয়ে সবাই দক্ষিণের অংশে গেলেন।

সদর ঘরের দরজা খোলা। বারান্দায় চেয়ারে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক লুঙ্গি ও পাঞ্জাবি পরে বসে রয়েছেন। একটি আঠারো উনিশ বছরের ছেলে সামনে বিষণ্ণ মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

এঁদের দেখে ভদ্রলোক শশব্যস্তে উঠে দাঁড়ালেন। হিতেনবাবু আলাপ করিয়ে দিলেন। কর্ণেল বললেন--আপনিই তাহলে এ বাড়ির মালিক? বাঃ, আলাপ করে খুশি হলুম মিঃ খান। অবশ্য, আপনার মানসিক অবস্থা বুঝতেই পারছি—একে ছিল ভূতের বাড়ি, এবার খুনের ঘটনা বেচারার বরাতে এসে পড়ল। এসব পুরনো বাড়িব কী যেন অভিশাপ আছে!

ইদ্রিস সায়েব অমায়িকভাবে হাসলেন। হাসিটা বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল।

—আর তুমিই তাহলে মিঃ সেলিমের আত্মীয়—রন্টু?

রন্টু মাথা নেড়ে হাসবার চেষ্টা করল।

-তুমি আমার ছেলের বয়সী। তাই নাম ধরে ডাকছি বা তুমি বলছি। রাগ করছ না তো ইয়ংম্যান?

—না স্যার, স্যার। কী যে বলেন?

- এস, আমরা ওই গাছটার নীচে যাই। একটু গল্প করে আসি।

কর্ণেল তার হাতে ধরে অন্তরঙ্গভাবে একটা অর্জুন গাছের তলায় নিয়ে গেলেন। জয়ন্তরা ইদ্রিস সায়েবের সঙ্গে গল্প করতে থাকল।

কর্ণেল বললেন—আচ্ছা রন্টু, তুমি খুনের দিন ঠিক ক'টায় এখানে এসেছিল?

—সে তো একবার বলেছি, স্যার! প্রায় চারটে-টারটে হবে। ঘড়ি দেখিনি!

—এসে ঠিক কী কী করেছিলে একটু বলো তো বাবা?

রন্টু নার্ভাস হয়ে বলল—এসে? এসে তো বাহাদুরকে ডাকলুম প্রথমে। বাহাদুরকে বললুম—আমার সেই দাদা আর তার বন্ধুরা আসছেন। সে যেন ফাইফরমাশ খেটে দেয় আগের মতো। বাহাদুর শুনে নিজের ঘরে চলে গেল। ওর বউটা খুব দজ্জাল মেয়ে স্যার! পাকা কুল শুকোতে দিয়েছিল, তার পাহারার ভার ছিল

বাহাদুরের ওপর। তাই......

—তারপর তুমি কী করলে?

—ঘর খুললুম। কিচেনে গিয়ে কুকার জ্বাললুম। তারপর চায়ের জল চাপিয়ে দিলুম। তারপর মিঃ গুপ্টাকে খবরটা দিতে গেলুম।

—ঠিক কতক্ষণ লাগল এসব কাজে?

—কতক্ষণ?

—ভেবে বলবে কিন্তু।

—বড়জোর মিনিট পনেরর বেশি নয়।

—কোন পথে মিঃ গুপ্টার কাছে গেলে?

—কেন? এই আগাছার ঝোপ পেরিয়ে। ওই তো পথটা রয়েছে।

—বেশ। গিয়ে কী করলে?

—আমি ওদিকের বারান্দায় উঠতেই মিঃ গুপ্টা বেরিয়ে এসে বললেন—কী খবর রন্নু? আমি বললুম—আজ সেলিমভাই আর তার বন্ধুরা পিকনিক করতে আসছে একটু পরেই। রাত্রে থাকবে। আপনাকে জানাতে বলেছে।

—মিঃ গুপ্টা কী বললেন?

—খুব খুশি হলেন মনে হল। কী আর বলবেন?

—সত্যি খুশি হলেন?

—হ্যাঁ।

—ভাবো। তোমাকে সময় দিলুম ভাবতে। ভেবে বলো!

রন্নু আরও নার্ভাস হয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। কর্ণেল ওর কাঁধে হাত রেখে ফের বললেন—কোন ভয় নেই। জাস্ট থিঙ্ক, মাই বয়!

—স্যার!

—হুঁ?

—মিঃ গুপ্টা বোধ হয় খুশি হননি।

—কেন, কেন?

—ওর মুখটা মনে পড়ছে স্যার। হ্যাঁ—মনে পড়ছে, উনি, ভুরু কুঁচকে ছিলেন। বলেছিলেন—তাই নাকি? এ অসময়ে পিকনিক! আছে ভালো সব! তারপর 'ঠিক আছে' বলে তক্ষুনি ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। আমার বেশ অবাক লেগেছিল কিন্তু। একটু খারাপও লেগেছিল। এলুম তাঁর কাছে, আর উনি হঠাৎ ঘরে ঢুকে পড়লেন···

—আচ্ছা, আচ্ছা! এবার বলো, কতক্ষণ তুমি দাঁড়িয়ে থাকলে?

—এক মিনিটও নয়। মনে হয়েছিল—হয়তো ব্যস্ত ছিলেন, তাই আমার সঙ্গে বেশীক্ষণ কথা বললেন না!

—ওঁর ঘরের কোন আওয়াজ তোমাদের কোন ঘরে পোঁছায়?

—না স্যার। সলিড দেয়াল রয়েছে ছাদ অব্দি। শুনেছি, দানিয়েল সায়েব তাঁর এক বন্ধুর জন্যে পরে বাড়িটার মাঝামাঝি দেয়াল তুলে দিয়েছিলেন। পরীক্ষা করলেই দেখতে পাবেন—সেজন্যেই ঘরগুলো ছোট হয়ে গেছে। সেই বন্ধু দানিয়েল সায়েবের স্ত্রীকে নাকি এলোপ করে পালান। তাই সায়েব শেষে পাগল হয়ে যান!

—তুমি অনেক খবর রাখো দেখছি। আচ্ছা রনু, তোমার কি মনে হয়েছিল, মিঃ গুপ্টার ঘরে তখন ওঁর স্ত্রী বাদে আর কেউ ছিল?

—আমি তো ভেতরে যাইনি স্যার।

—তাহলেও জাস্ট একটা আইডিয়ার কথা বলছি।

—স্যার!

—হুঁ, বলো রনু।

—স্যার, আপনি ঠিকই বলেছেন।

—হুঁউ?

—আমার তাই মনে হয়েছিল বটে। ঘরে কারো সঙ্গে কথা বলতে বলতে উঠে এসেছিলেন যেন গুপ্টা সায়েব। কারণ, আমার পায়ের শব্দ পেয়েই উনি বেরোলেন! তারপর হঠাৎ আবার চলে গেলেন! হ্যাঁ—একটা আবছা ধারণা হয়েছিল মনে পড়ছে। তাছাড়া···

—তাছাড়া?

—ওঁকে একটু মাতালও মনে হচ্ছিল। মদের গন্ধ পেয়েছিলুম।

—সেটা ঠিকই। কারণ, যে বোতলটা পাওয়া গেছে, তাতে মদ স্যার অল্পই ছিল। আচ্ছা, চলো—আমার কথা শেষ হয়েছে।

চলতে চলতে রন্নু বলল—কোন বিপদ হবে না তো স্যার?

—কেন?

—এত সব তো পুলিসকে বলিনি!

—না, না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। বলে কর্ণেল বারান্দার দিকে এগিয়ে গেলেন। কর্ণেল ভাবছিলেন, দুটো গ্লাস পাওয়া গেছে। তৃতীয়টা গেল কোথায়?...

ফেরার পথে পুলিসের গাড়িতে বসে কর্ণেল ফাইলটা খুললেন। মিঃ গুপ্টার কর্মচারী আনন্দের বিবৃতিটা পড়তে লাগলেন।

আনন্দ ৭ই মার্চ বিকেলে ক্যামাক স্ট্রীট ফ্ল্যাটের জিনিসপত্তর ট্রাকে যাবার সময় সঙ্গে যায়। সব গোছগাছ করতে রাত দশটা বাজে ওখানে। মিঃ গুপ্টা জানান, পরদিন অফিস বন্ধ থাকবে। তিনি বিশ্রাম নেবেন। আনন্দরও ছুটি। তবে ৮ই মার্চ সকালে ওঁর বড় বউকে যেন সে জানিয়ে আসে—সায়েব হঠাৎ কাজে দিল্লী গেছেন। ফিরবেন ১০ই মার্চ। হ্যাঁ, আনন্দ জানে—বড় বউ এতে কিছু হইচই করেন না। স্বামীর খামখেয়ালী আচরণে তিনি অভ্যস্ত। যাই হোক, আনন্দ কথামতো সব করেছিল।

এসব বিবৃতির প্রতি বরাবর কর্ণেল গুরুত্ব দেন না। প্রচলিত গতানুগতিক ঢঙে একজন পুলিস অফিসার খসখস করে লিখে যান এবং সই করিয়ে নেন। খুঁটিয়ে কিছু প্রশ্ন করা হয় খুব কমই। অর্থাৎ পুলিশের পদ্ধতি হল ইনডাকটিভ। আগে সিদ্ধান্তে পৌঁছেই ওঁরা প্রমাণ হাতড়াতে ব্যস্ত হন। কর্ণেলের হল উল্টো—ডিডাকটিভ। আগে প্রমাণ, পরে সিদ্ধান্ত।

সুতরাং আনন্দকে মুখোমুখি চাই। একটা প্রশ্ন খুব তীব্র। মিঃ গুপ্টা হঠাৎ রাতারাতি কেন বাগানবাড়িতে চলে এলেন ঊর্মিকে নিয়ে? আনন্দকে তিনি এর কৈফিয়ৎ দিয়েছিলেন কি? কিংবা আনন্দের কি কোন কৌতূহল হয়নি?

ইদ্রিস সায়েব বলছেন—২১শে মার্চ ও বাড়িতে মিঃ গুপ্টা আসার কথা ছিল। কিন্তু হঠাৎ ৭ই মার্চ দুপুরে মিঃ গুপ্টা ইদ্রিস সায়েবের কলকাতার অফিসে ফোন করে বলেন যে এদিনই তিনি যেতে চান। ইদ্রিস সায়েব আপত্তি করেন নি। তাজ্জব হয়েছিলেন কি? তা তো হবারই কথা। তবে তাজ্জব হয়েছিলেন অন্য কারণে নয়—লোকে এই বয়সেও কচি বউয়ের বায়না মেটাতে অমন পাগল হয়, সেটা লক্ষ্য করেই। ইদ্রিসের ধারণা, ওঁর দ্বিতীয়পক্ষটি খুব খামখেয়ালী বিবি ছিলেন। হঠাৎ 'উঠল বাই তো মক্কা যাই' গোছের স্রেফ খেয়াল ছাড়া আর কিছু নয়।

তাছাড়া গুপ্টা সায়েব ওবাড়িতে গিয়ে থাকলে ইদ্রিসের একটা বড় অস্বস্তি দূর হয়। কেউ আর গিয়ে জবরদখল করে বসতে পারবে না। সরকারও 'খালি কোঠি' বলে বেমক্কা কেড়ে নিতে পারবেন না। ঠিক এজন্যেই তো ইদ্রিস কষ্ট করে মাসের পর মাস কলকাতা থেকে গিয়ে ওখানে রাত কাটাতেন।

তাই উনি প্রস্তাবটা শোনামাত্র বলেছিলেন—ইন্‌শা আল্লা! খুব ভালো, উম্‌দা বাত আছে। চলে যান এক্ষুনি, কোঠি তো আপনার আছে গুপ্টা সায়েব। রন্থু বাহাদুরকে চাবি দিয়ে আসছে। সব সমঝে দিচ্ছি ওকে। আভি পাঠাচ্ছি। বাহাদুর ঝামেলা করবে না।

ইদ্রিস খানের কাছে কিছু আর নতুন জানার নেই। এখন আনন্দকে দরকার। কর্ণেল একটি কেসে বললেন—জয়ন্ত, আমি মিঃ গুপ্টার কর্মচারী আনন্দবাবুর সঙ্গে একবার কথা বলতে চাই।

জয়ন্ত বলল—নিশ্চয় বললেন। চলুন, লালবাজার পৌঁছেই ওকে ডেকে পাঠাচ্ছি।

কর্ণেল ঘড়ি দেখে বললেন—আমি এখন কিন্তু লালবাজার যাচ্ছি না তোমার সঙ্গে।. বাসায় ফিরতে চাই। তুমি বরং আনন্দবাবুকে আমার বাসায় যেতে বলো। ঠিকানা দিয়ে দিও।

কর্ণেল বাকি পথ চুপ করে থাকলেন। হুম্‌, বাহাদুর লোকটা বউকে বড্ড ডরায়। রণু ঠিকই বলছিল। সব সময় সে বাচ্চা কোলে

নিয়ে পাকা কুল পাহারা দেয় বউয়ের হুকুমে। আর দক্ষিণের গেটের দিকে লক্ষ্য রাখে। কেউ ঢুকলে ওখান থেকেই ধমক দেয়। উত্তরের দিকে কিছু ঘটিলে সে টেরও পায় না। ৭ই মার্চ মাত্র একবার ওদিকে গিয়ে নতুন সায়েবকে দরজা খুলে দিয়েই দৌড়ে নিজের কাজে চলে এসেছিল সে। সেদিন আর যায় নি। গিয়েছিল ওর বউ লক্ষ্মীরাণী। লক্ষ্মী সায়েবদের এক বালতি জল দিয়ে আসে সন্ধ্যার দিকে। তারপর সেও আর সেদিনের মতো যায়নি। পরদিন ৮ই মার্চ সকালে বাহাদুরকে ডাকেন সায়েব। বাহাদুরকে এক বালতি জল দিতে বলেন। সে জল দিয়ে আসে। দুপুরে একবার সায়েব ও মেমসায়েব বেরিয়েছিলেন। দক্ষিণের গেট দিয়ে হেঁটে দু'জনে বেরোন। সেই সময় বাহাদুরকে জিগ্যেস করেন, কোন্ রাস্তায় গেলে বাজার বা হোটেল পড়বে। ওঁরা খেতে বেরিয়েছিলেন। ফেরেন আন্দাজ ঘণ্টা দুই পরে। বাজারের দিকে তিনটে বড় হোটেল আছে। পান্থনিবাস হোটেলের মালিক যা বর্ণনা দিয়েছে, তাতে বোঝা যায় যে ওঁরা সেখানেই লাঞ্চ সেরেছিলেন। বাহাদুরের বউ লক্ষ্মী খুব চাপা মেয়ে। খুব কম কথা বলে। কী যেন জানে ও, বলতে চায় না।

কর্ণেল একবার ভাবলেন, এ তাঁর নিছক অনুমান—পরে ভাবলেন, তাহলে লক্ষ্মীর মুখে কেন হঠাৎ অমন ভাবান্তর লক্ষ্য করলেন তখন?

ভাবান্তর একটা ঘটেছিলই। উত্তরোত্তর এ সন্দেহ দৃঢ় হল। লক্ষ্মী কিছু একটা গোপন করেছে, এ ধারণা কিছুতেই গেল না কর্ণেলের মন থেকে।

কিন্তু ওই অশিক্ষিতা লক্ষ্মীর কাছ থেকে কথা আদায় করা স্বয়ং ঈশ্বরের পক্ষেও যেন অসম্ভব। অনেক কূট প্রশ্ন করেও পাত্তা পাননি কর্ণেল। লক্ষ্মীর এক কথা সে ওদিকে আর যায়নি। কিচ্ছু শোনেন বা দেখেওনি।

অথচ······

কর্ণেল নড়েচড়ে বললেন। শ্যামবাজার চৌমাথা পেরোচ্ছে পুলিসের গাড়ি। বললেন—আমাকে চিত্তরঞ্জন এভেনিউতে মহাত্মা গান্ধী

রোডের মোড়ে নামিয়ে দেবে, জয়ন্ত।

জয়ন্ত বলল—কেন? বাসায় ফিরবেন না?

—ফিরব। ওখানে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে যাব। আমার জন্যে ব্যস্ত হয়ো না।

—আপনার লাঞ্চের দেরি হয়ে যাবে কিন্তু।

কর্ণেল হাসলেন। —না। ওখানে আমার নেমন্তন্ন আছে। এইমাত্র মনে পড়ল!

বড় রাস্তার ওপর বাড়িটা। পাঁচতলা বিশাল বাড়ি। রাজস্থানী স্থাপত্য। কর্ণেল মুখ তুলে এক মিনিট বাড়িটার ছাদ অব্দি দেখলেন। তারপর সরু গলিতে ঢুকলেন। বাঁদিকে চওড়া সিঁড়ি। লিফট নেই। বুড়োদের পক্ষে নিশ্চয় খুব কষ্টকর ব্যাপার। তবে কর্ণেল অন্য মানুষ। এখনও অনেক কুস্তিগীরকে ধরাশায়ী করার মতো জোর ও কৌশল তাঁর আছে।

অবশ্য কেউ তাকে এ বাড়িতে লড়াই দেবার জন্যে অপেক্ষা করছে না। চারতলায় উঠে একটা ফ্ল্যাটের বোতাম টিপলেন। এখন অসময় দেখা করার পক্ষে। কিন্তু কাজটা সেরেই যেতে হবে।

একটি সুন্দর স্বাস্থ্যবান কিশোর দরজা খুলে হিন্দীতে বলল—কাকে চান?

—তোমার নাম কী বাবা?…বলে কর্ণেল মিষ্টি হেসে ওর চিবুকটা নেড়ে দিলেন।

কিশোরটি ভুরু কুঁচকে ওঁকে দেখছিল। এবার বিরক্ত হয়ে বলল—কে আপনি?

—তোমার বাবার বন্ধু। মাকে বলো আমার কথা।

কিশোরটি মুখ ঘুরিয়ে ডাকল—মা, দেখ তো কে এসেছেন!

একটি মহিলা—চল্লিশের মধ্যে বয়স, সুশ্রী চেহারা, দরজার কাছে এসে বললেন—কাকে চাই আপনার?

কর্ণেল একটু হাসলেন। —আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই। মিঃ গুপ্টার…

মহিলাটি গম্ভীর হয়ে বললেন—আপনি কি পুলিসের লোক?

কর্ণেল জবাব দিলেন—মোটেও না। আমি মিঃ গুপ্টার একজন বন্ধু। দুঃখের ব্যাপার, কাগজে ওঁর মৃত্যুর খবর দেখলুম—প্রথমে বুঝতেই পারিনি উনি আমার বন্ধু প্রকাশ গুপ্টা কি না। পরে খোঁজ নিয়ে জানলুম, ব্যাপারটা তাই। খুব বিচলিত হয়ে পড়লুম। ওঁর সঙ্গে আমার বহুকালের দোস্তি ছিল। বেচারা গুপ্টা…

মহিলাটির দু'চোখ হঠাৎ জ্বলে উঠল। —থাক্। আর দোস্তের জন্য আপনি সিমপ্যাথি দেখাবেন না। আপনারাই তো ওঁকে পাপের পথে ঠেলে দিয়েছেন! আপনারাই অমন ভাল মানুষটার সর্বনাশ করেছেন! এখন এসেছেন আমাকে সান্ত্বনা দিতে! আমি কারও সান্ত্বনা চাইনে! আপনি দয়া করে আসুন!

কর্ণেল বিব্রতমুখে কিছু বলতে যাচ্ছেন, সেই সময় একটি যুবক মিসেস্ গুপ্টার পিছনে এসে দাঁড়াল। তার চেহারা দেখে মনে হল, সে বাঙালী। সে বলল—কী হয়েছে ভাবীজী? কে উনি?

কর্ণেল বাংলায় বললেন—যদি আমার ভুল না হয়ে থাকে, মাই ডিয়ার ইয়ংম্যান, আপনি নিশ্চই আনন্দ সান্যাল?

—হ্যাঁ। আপনি কে?

—বলছি। কিন্তু এভাবে দাঁড়িয়ে তো কথা বলা যাবে না আনন্দবাবু!

মিসেস্ গুপ্টা আর একবার ওঁর আপাদমস্তক দেখে নিয়ে সন্দিগ্ধভাবে বললেন—খুব জুরুরী কিছু বলার থাকলে আসুন। তবে আগেই বলে রাখছি, কোম্পানির কোন ব্যাপারে আমি এখন কথা বলব না। বোম্বে থেকে আমার দেওর আসছে। সে এলে কথা হবে।

কর্ণেল একটু হেসে বললেন—আনন্দবাবু, আপনার বন্ধুরা—মানে পারুল এ্যাডের বিজনবাবুরা আমাকে চেনেন। আমি…

আনন্দ এবার লাফিয়ে উঠল।—চিনেছি স্যার! আপনি কর্ণেল সরকার। ডেসক্রিপসন মিলে যাচ্ছে। আমি আপনার কাছে যেতুম, স্যার।

মিসেস্ গুপ্টা অবাক হয়ে আনন্দের দিকে তাকালেন। আনন্দ ওঁর কানেকানে কিছু বলল। তখন উনি বললেন—আপ অন্দর আইয়ে!

মিঃ গুপ্টার বড় বউ জাঁদরেল ধরনের গৃহিণী সন্দেহ নেই। ঘরদোর পরিচ্ছন্ন, সাজানো গোছানো। সবখানে পরিবারের ধর্মানুরাগের পরিচয় সুপ্রকট। বসার ঘরে ঢুকে কর্ণেল লক্ষ্য করলেন—মিঃ গুপ্টার একটি বিশাল ছবিতে মালা দেওয়া রয়েছে। ভারতীয় নারীরা সত্যি খুব অবাক করে দেয়! একটি বারো-তের বছরের ফুটফুটে মেয়ে ও একটি আট-ন'বছর বয়সের সুন্দর ছেলে একবার উঁকি দিয়ে চলে গেল। আঃ, এমন সুন্দর পবিত্র সংসার ফেলে প্রকাশ গুপ্টা কী খুঁজে পেয়েছিল মিলি সেনের কাছে? ভাবতে কষ্ট হয়।

কর্ণেল বসলেন। আনন্দও একপাশে বসল। মিসেস্ গুপ্টা সামনে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে রইলেন। শোকের মলিনতা এরই মধ্যে কাটিয়ে উঠেছেন মহিলাটি। এটা মেয়েরাই পারে সম্ভবতঃ। তারা সর্বংসহা। কর্ণেল মনে মনে তারিফ করলেন।

আনন্দ বলল—জানেন? আমিও বিজনদের সঙ্গে আপনার কাছে যেতুম। কিন্তু এ বাড়িতে ভাবীজীকে সামলানো, ওদিকে কোম্পানি—এসব নিয়ে একটু ফুরসত পাচ্ছিলুম না।

কর্ণেল বললেন—আনন্দবাবু, আপনাকে আমি পরে প্রশ্ন করব। আপাততঃ মিসেস্ গুপ্টার সঙ্গে কিছু জরুরী কথা সেরে নিই।

মিসেস্ গুপ্টা বললেন—বলুন।

—আপনি বসুন, প্লীজ।

উনি বসলেন। কর্ণেল এক মিনিট চুপ করে থাকার পর বললেন—উর্মি দেবীর সঙ্গে মিঃ গুপ্টার সম্পর্কের কথা কি আপনি জানতেন?

মিসেস্ গুপ্টা মুখ নামিয়ে জবাব দিলেন—হ্যাঁ।

আনন্দ চমকে গেল, তা লক্ষ্য করলেন কর্ণেল। তারপর বললেন—আনন্দের কাছে শুনেছিলেন—নাকি অন্য কোন উপায়ে জেনেছিলেন?

—আনন্দ আমাকে কিচ্ছু জানায়নি। বেচারীকে আমি এর জন্যে এতটুকু দোষ দিইনে। ও খুব ভাল ছেলে। ও মাথার ওপর না থাকলে আজ খুব বিপদে পড়ে যেতুম। ও কী করবে? মনিবের বদমাইসি কি তার কর্মচারী মনিবের স্ত্রীর কাছে বলতে সাহস পায়? তবে আমি বরাবর জানতুম। জেনেও আর কী করব? মিঃ গুপ্টাকে ফেরাবার সাধ্য আমার ছিল না।

—কীভাবে জানতে পেরেছিলেন?

—সে অনেক কথা। গত বছর অব্দি আমরা বোম্বেতে ছিলুম। ওঁর ব্যবসাও ছিল সেখানে। মেসিনারি জিনিসপত্রের দালালীর কারবার ছিল—কতকটা অর্ডার সাপ্লায়ের মতো। হঠাৎ উনি কলকাতায় ব্যবসা করবেন বললেন। চলেও এলেন। দু'মাস পরে আমাদের নিয়ে এলেন। আমি ভাবলুম, ভাল হল। বেশ্যা মেয়েটার হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল। কিন্তু এখানে এসেই টের পেলুম, ওঁর কলকাতা আসার কারণ কী। মেয়েটা ক্যামাক স্ট্রিটের একটা ফ্ল্যাটে রয়েছে। আর···

বাধা দিলেন কর্ণেল।—আপনার প্রথম প্রশ্নের জবাব পাইনি কিন্তু!

—হ্যাঁ, বোম্বেতে উনি ফিল্ম লাইনেও ঘুরতেন। বলতেন—ছবি প্রডিউস করবেন। ওঁর এক বন্ধু ছিলেন প্রডিউসার। ভদ্রলোক মাদ্রাজী—নাম, নারায়ণ কুমারমঙ্গলম।

—মাদ্রাজী! কর্ণেল চমকে উঠলেন।

—হ্যাঁ।···বলে একটু চুপ করে গেলেন মিসেস্ গুপ্টা। তারপর বললেন—এসব কথা বলা হয়তো উচিত নয়। কিন্তু বলছি। পাপ কখনও চাপা থাকে না। কুমারমঙ্গলমের সঙ্গে মিলে উনি ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রিতে ঢুকতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কুমারমঙ্গলমও খুব একটা পয়সাওয়ালা ছিলেন না। কিন্তু মাথায় ফিল্মের হাওয়া ঢুকলে যা হয়। দুই বন্ধু মিলে ষড়যন্ত্র করলেন। মিঃ গুপ্টার দু'ভাই। বড়ভাই মারা গিয়েছিলেন অনেক পয়সা কামিয়ে। ওঁর একটিমাত্র ছেলে ছিল—নাম রূপেশ।

কর্ণেল দ্বিতীয়বার চমকে উঠলেন।—রূপেশকুমার!

—হ্যাঁ, ফিল্মে ওই নাম নিয়েছিল বেচারা। বোকা ছেলে! চাচার ষড়যন্ত্র জানতে পারেনি। রূপেশের মাও সরল সাদাসিধে মেয়ে। আমার স্বামী ভেবেছিলেন, রূপেশকে সরাতে পারলে ওঁর সম্পত্তি কায়দা করতে দেরি হবে না। সেই লোভে আমার স্বামী স্যুটিংয়ের সময় নকল রিভলবারের বদলে আসল গুলিভরা রিভলবার পাচার করলেন বেশ্যা মেয়েটার হাতে। সে ছিল ওই ছবির হিরোইন। আগে থেকে সব ঠিক করা ছিল।

—কিন্তু আপনি জানলেন কীভাবে, এখনও বলেননি কিন্তু!

—আমাদের সোফার ছিল আমার বাবার দেশের লোক। তার কাছে জেনেছিলাম। কলকাতায় এসে তার কাছেই জানতে পারলুম, এখানে আমার স্বামী কী করছেন।

—হুম্, তারপর?

—গাড়িটা বেচে দিলেন উনি গত মাসে। বেচারার চাকরিও গেল। ও বোম্বে ফিরে গেল। যাবার দিন দেখা করেও যায়। এখন ভাবছি, লোকটা থাকলে হয়তো আরও অনেক কিছু জানতে পারতুম।

—মিঃ গুপ্টা এবং উর্মি দেবীকে কে খুন করেছে বলে আপনার ধারণা, জানতে পারি কি মা?

মাথা নাড়লেন মিসেস্ গুপ্টা।—জানি না। তবে আমার সন্দেহ···

—হ্যাঁ, বলুন, বলুন!

—সন্দেহ করতুম না। কিন্তু আনন্দ এতদিনে সন্দেহটা মাথায় ঢুকিয়ে দিল। আনন্দই বলুক বরং।

কর্ণেল আনন্দের দিকে সপ্রশ্ন তাকালেন। আনন্দ কুণ্ঠিত মুখে বলল—সন্দেহটা ভুল হতেও পারে। তবে মাঝেমাঝে বেন্টিক স্ট্রীটের একটা বাড়িতে এক ভদ্রলোকের কাছে আমাকে পাঠাতেন সায়েব। একটা প্যাকেট দিতেন উনি। প্যাকেটটা গুপ্টা সায়েবকে পৌঁছে দিতাম। বেশ বড় প্যাকেট। বলতেন—স্মাগলিং করে আনা বিলিতী মদ আছে। কখনও বলতেন—কাপড় আছে। বার তিনেক আমি এনেছি

গত তিনমাসে। প্রতি মাসের প্রথম সপ্তায় নির্দিষ্ট একটা তারিখে আমাকে যেতে হত। কোন মাসে ছ তারিখ, কোন মাসে সাত তারিখে। ভদ্রলোক খুব বদরাগী। সায়েবেরই বয়সী। ফেব্রুয়ারী মাসের সাত তারিখে গেলে প্যাকেট দিলেন—বেশ ভারী। কিন্তু খুব ধমকালেন আমাকে। তারপর বললেন—গুপ্টাকে বলো, আর কারবার চলবে না এভাবে। সব কিছুর শেষ হয়ে যাবে। আমি তো তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলুম। ফিরে এসে ওঁকে বললে উনি রেগে গেলেন। বললেন ঠিক আছে, আমি এবার থেকে নিজেই যাব মোকাবিলা করতে।

কর্ণেল হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন।—আজ চলি তাহলে। আনন্দবাবু বেন্টিক স্ট্রীটের সেই ঠিকানাটি কি আপনার মনে আছে?

আনন্দ বলল—খুব আছে স্যার।

—একটা কাগজে লিখে দিন।

মিসেস্ গুপ্টা শশব্যস্তে বললেন—কর্ণেল সাহাব, প্লীজ মাফ করবেন। এক গেলাস সরবত খেয়ে যান। আমার ভুল হয়ে গেছে।

কর্ণেল হাত তুলে মিষ্টি হাসলেন। —পরে হবে মা, আজ চলি।

ছয়

শেষ দৃশ্য

পরদিন সকালে কর্ণেলের ফ্ল্যাটের দরজায় ঘণ্টা বাজল। মিসেস্ এ্যারাথুন এসে জানালেন—কে একজন দেখা করতে এসেছেন। জেণ্টলম্যান, স্মার্ট চেহারা, বিগম্যান বলে মনে হচ্ছে।

কর্ণেল বললেন—পাঠিয়ে দাও।

একটু পরেই ভদ্রলোক ঢুকলেন। খুব উদ্বিগ্ন, ব্যস্ত আর উত্তেজিত। কর্ণেল মিসেস্ এ্যারাথুনের বর্ণনার কথা মনে করে হাসলেন। তারপর বললেন—আসুন মিঃ ভরদ্বাজ, বসুন।

- আপনি আমাকে চেনেন?

—ছবি দেখেছিলুম। বসুন দয়া করে।

অবনীবাবু বসলেন। —কী ব্যাপার কর্ণেল সরকার? সেলিম ট্রাঙ্ককল করল—ওদিকে বোম্বে পুলিস গতকাল স্টেটমেণ্ট নিল, আমি বোম্বে থেকে রওনা হওয়ার সময় থেকে বোম্বে ফেরা অব্দি কোথায় কোথায় গেছি বা কী করেছি! হরিবল্ ব্যাপার!

—উদ্বিগ্ন হবার কোন কারণ নেই মিঃ ভরদ্বাজ।

—অদ্ভুত ব্যাপার। সেলিম খুলে কিছু বলেনি। শুধু বলল—যদি স্ক্যাণ্ডালের হাত থেকে বাঁচতে চান, অবনীদা, এক্ষুনি কলকাতা এসে কর্ণেল সরকারের সঙ্গে দেখা করুন। ও আপনার ঠিকানাও জানিয়েছিল। আমি এইমাত্র দমদম এয়ারপোর্ট থেকে সটান আপনার কাছে চলে এসেছি।

—সেলিমকে আমিই কাল বিকেলে ট্রাঙ্ককল করতে বলেছিলুম।

—কিন্তু ব্যাপারটা কী?

কর্ণেল ওঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ বললেন—৮ই মার্চ বিকেলে ঠিক ক'টায় আপনি বারাকপুর কুঠিবাড়িতে গিয়েছিলেন ?

অবনীবাবু চমকে উঠে বললেন—আমি ? আমি…

—প্লীজ. গোপন করবেন না।

—হ্যাঁ। গিয়েছিলুম মিলি আমাকে বলেছিল ওইদিন বিকেলে ওখানে যেতে।

—মিলির সঙ্গে আপনার যোগাযোগ ছিল তাহলে ?

—মোটেই না। হঠাৎ বোম্বেতে ওর চিঠি পেয়েছিলুম। দীর্ঘ চিঠি। রূপেশকে হত্যার ষড়যন্ত্র এবং আদ্যোপান্ত সব লিখেছিল। ও নাকি এতদিনে ভুল বুঝতে পেরেছে। তাছাড়া খুব বিপন্ন হয়ে পড়েছে। মাসের পর মাস ওকে ব্ল্যাকমেইল করছে একজন। আমি গিয়ে যেন ওকে বাঁচাই। চিঠি পেয়ে খুব মায়া হল। ইতিমধ্যে কলকাতা যাবার প্রোগাম ছিল আমার। এলুম—এসে ওর কথামতো ফোন করলুম। ও একটা জায়গার নাম বলল—দক্ষিণ কলকাতার একটা রেস্তোঁরায়। সেখানে দেখা হল। খুব কান্নাকাটি করল। ওকে বাঁচাতে হবে। ওকে ব্ল্যাকমেইল করা হচ্ছে অদ্ভুতভাবে।

—রাইট, রাইট। এমন আজব ব্ল্যাকমেইলের কথা শোনা যায় না! ওকে ব্ল্যাকমেলারের স্ত্রী সেজে থাকতে বাধ্য করা হচ্ছে। নয়তো ফেরারী আসামীকে তক্ষুনি পুলিসের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

—আপনি তাহলে জানেন !

—আমার ধারণা তাই। আপনি এবার বলুন।

—মিলির মতে, এতে একটা সুবিধে অবশ্য তার হচ্ছে। ব্ল্যাক-মেলার মিঃ গুপ্টার আশ্রয়ে থাকায় পুলিসের দিক থেকে নিশ্চিন্ত থাকছে সে। বিনিময়ে বেচারাকে দেহটা ভোগ করতে দিতে হচ্ছে। কিন্তু এ তো বরাবর মানুষ পারে না। ও একটা মুক্তি খুঁজছে। আমি ছাড়া কেউ নাকি ওকে বাঁচাতে পারে না। যাই হোক, আমি উদ্বিগ্ন হলুম। আফটার অল, অমন চেহারা—শিখিয়ে পড়িয়ে ভবিষ্যতে

স্টার করার সম্ভাবনা নিশ্চয় ছিল। আমি ভাবতে থাকলুম, কী করা যায়। ও আমার হোটেলের ঠিকানা নিল। পরদিন দুপুরে—৭ই মার্চ তারিখে ফের ফোন করবে বলল। তারপর ঠিকই ফোন করল। কিন্তু হঠাৎ নাকি মিঃ গুপ্টা ওকে বারাকপুর বাগানবাড়িতে নিয়ে যাচ্ছে। অতএব আমি যেন ৮ই মার্চ বিকেলে ওখানে চুপি চুপি গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করি। মিঃ গুপ্টা ওসময় কলকাতায় থাকবে। মিলি জানে, গুপ্টাকে নাকি ওইদিন বিকেলে কলকাতায় থাকতেই হবে।

—আপনি তাহলে কথামতো গেলেন?

—হ্যাঁ। কিন্তু গেটের কাছে ট্যাকসি থেকে নামতেই দেখি এদিকের বারান্দায় একটি ছেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মিলি আমাকে উত্তর দিক ঘুরে যেতে বলেছিল। কঠোরভাবে নিষেধ করেছিল যে যেন কেউ আমাকে না দেখতে পায়। কারণ, মিলির কাছে কে আসে—গুপ্টা তার কড়া খবর রাখতে অভ্যস্ত। সে জানতে পারলে মিলিকে মারধোর করবে। অতএব উত্তর দিক ঘুরে ভাঙা পাঁচিল গলিয়ে ঢুকলুম। ঢুকে দরজায় কড়া নাড়লুম। কোন সাড়া পেলুম না। ঠেলতেই দরজা ফাঁক হল। তখন ঢুকে ওর নাম ধরে ডাকলুম। কানের ভুল হতেও পারে—আবছা শব্দে মনে হল, ও আসছে। তখন নিশ্চিন্ত হয়ে বসার ঘরের সোফায় বসলুম। বসে আছি তো আছিই। তখন অবাক লাগল। হঠাৎ দেখি কে একজন সাঁৎ করে ঘর দিয়ে বেরিয়ে গেল। চেনা মনে হল। ওই ঘরটায় দেখেছেন নিশ্চয়, একেবারে আলো থাকে না দিনদুপুরেও। কিন্তু যেমনি ও বাইরের দরজার পর্দা তুলল, চিনলুম। তখন অজানা ভয়ে বুক কেঁপে উঠল। এ যে মিঃ গুপ্টার সেই জুটি! তখন বেডরুমে গিয়ে উঁকি দিলুম। তারপর যা দেখলুম, আমার দম বন্ধ হয়ে গেল।···

—কিন্তু জুতো খুলে রেখে কেন?

—পায়ে হাল্কা স্লিপার ছিল। পা তুলেই বসেছিলুম। সেই অবস্থায় ব্যস্ত হয়ে উঠে গেছি।

—প্লীজ, গোপন করবেন না।

একটু ইতস্ততঃ করে অবনীবাবু বললেন—মানে, আমার সাবকনসাস মনে হয়ত ধারণা হয়েছিল যে কোন ফাঁদে পড়ে গেছি! নির্ঘাৎ মিলিকে ব্যাটা খুন করেছে! জাস্ট ইনটুইশান! এ অবস্থায় আমার সতর্ক হওয়া দরকার মনে হয়েছিল।

—আপনি বুদ্ধিমান, মিঃ ভরদ্বাজ। যাই হোক, গিয়ে দেখলেন দুটি মৃতদেহ পড়ে রয়েছে।

—হ্যাঁ। সে এক বীভৎস দৃশ্য! আমি জুতো আর পায়ে দিলুম না—পাছে জুতোর ছাপ পড়ে। অমনি বেরিয়ে সেই পাঁচিল ডিঙিয়ে পালালুম।

—আপনি কিন্তু ওই ঘরে বসে একটি সিগ্রেট খেয়েছিলেন।

—হ্যাঁ।

—দেখুন মিঃ ভরদ্বাজ, খুনীকে আপনি ছাড়াও আরো দু'জন দেখেছিল। তার আসার সময় দেখেছিল, যাবার সময় কিন্তু দেখতে পায়নি আর। কারণ, সে পালিয়েছিল সেই ভাঙা পাঁচিলের পথে। তার কাছে একটা গ্লাস ছিল আপনি দেখেননি নিশ্চয়?

—না। লক্ষ্য করিনি। কেন, গ্লাস কেন?

—পরে বলব'খর। গ্লাসটা কাল বিকেলে ফরেনসিক এক্সপার্টরা ভাঙা পাঁচিলের ইটের তলায় আবিষ্কার করেছে। আমি কাল সন্ধ্যায় আবার ওখানে গিয়েছিলুম। অবশ্য ছুরিটা পাইনি।

—কিন্তু আর কারা দেখেছিল ব্যাটাকে?

—বাহাদুর দারোয়ান আর তার বউ। বাহাদুর তো বউকে ভীষণ ভয় করে। ওর বউ চেপে গিয়েছিল—পাছে পুলিসের হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়ে। কাল চাপে পড়ে বাহাদুরের বউ সব কবুল করেছে।

—কিন্তু কর্ণেল সরকার, এখনও আমি বুঝতে পারছি না, কেন কুমারমঙ্গলম খুন করল গুপ্টা আর মিলিকে?

—এ ব্যাপারটাকে বলব এ সার্কেল অফ ব্ল্যাকমেলিং। একটা বৃত্তের মতো। গুপ্টা ব্ল্যাকমেইল শুধু মিলিকেই করত না, কুমারমঙ্গলমকেও করত। কারণ রিভলভারটার মালিক ছিল কুমারমঙ্গলম। অস্ত্রটা

মিলি স্ক্যাটিংয়ের জায়গাতেই ফেলে রেখে আসে—তা আপনি নিশ্চয় জানেন! রীতিমতো লাইসেন্স ছিল কুমারমঙ্গলমের নামে। তাই তাকেও ফেরার হতে হয়। ঘুঘু প্রকাশ গুপ্টা কী ভাবে জানতে পারে যে লোকটা কলকাতায় রয়েছে। সম্ভবতঃ মিলি কুমারমঙ্গলমের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। সে রহস্য অবশ্য এখন আর জানা কঠিন। যদি কুমারমঙ্গলম কবুল করে, তবে অন্য কথা।

এই সময় ফোনে রিঙ বাজল। কর্ণেল রিসিভার তুলে বললেন—হ্যালো, এন. এস কথা বলছি।

—কর্ণেল! আমি জয়ন্ত বলছি। গুড নিউজ।

—পাখি ধরেছ?

—হ্যাঁ। চলে আসুন কর্ণেল।

—অবশ্যই।

* * * *

মি: কুমারমঙ্গলমকে তখন বেন্টিক স্ট্রীটের বাড়ী থেকে লালবাজারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বাহাদুর, তার বউ, অবনী ভরদ্বাজ—তিনজনেই সনাক্ত করেছে। আনন্দও এক সময় এসে সনাক্ত করল। হ্যাঁ—এর কাছ থেকেই প্যাকেট নিয়ে যেত সে।

প্যাকেটে থাকত টাকা। কুমারমঙ্গলম কলকাতায় এসে চোরা নার্কোটিকসের ব্যবসা ধরেছিল। বেশ কামাচ্ছিল। কিন্তু মনে শান্তি ছিল না। প্রকাশ গুপ্টার চোখকে সে ফাঁকি দিতে পারে নি।

এমন ঢালাও অবাধ চোরাকারবারের জায়গা তো আর কোথাও নেই। টাকার লোভে কুমারমঙ্গলম চলে যেতে পারছিল না। অতএব ঠিক করল যে গুপ্টাকে সরাতে হবে। তাই সে মিলির সঙ্গে যোগাযোগ করল। মিলি গুপ্টাকে অনেক আগেই জানে মেরে দিতে পারত। সাহস পাচ্ছিল না। এবার দোসর জুটে সাহস পেল। কিন্তু ক্যামাক স্ট্রীটের ফ্ল্যাটে কাজটা করার চেয়ে কোন নির্জন জায়গা সে খুঁজল। দানিয়েল কুঠি কিনতে চেয়েছিল গুপ্টা নিজে—বড় বউয়ের দৃষ্টির আড়াল

হবার জন্যে। মিলি প্ল্যানটা কাজে লাগাল। তবে গুপ্টা তড়িঘড়ি বাগানবাড়িতে চলে যাবার কারণ অবনী ভরদ্বাজের আবির্ভাব। মিলির ফোনে ট্যাপ করা ছিল। গুপ্টা সব টের পেয়েছিল তাই।

পটাসিয়াম সাইনায়েড কুমারমঙ্গলম দিয়েছিল মিলিকে। গুপ্টার সেদিন টাকা আনতে যাবার কথা ওর কাছে। কিন্তু মনে সন্দেহ। তাই থেকে গেল সেদিনটা। নড়ল না। মিলি ওকে আদর করে মদ দিল। গুপ্টা কিন্তু এদিকটা ভাবে নি কখনও। মদে চুমুক দিয়েই পড়ে গেল। মিলি তখন ছটফট করছে। পালাতে হবে। কুমারমঙ্গলের অপেক্ষা করছে সে। অবশেষে কুমারমঙ্গলম এল। লাসের কাছে দাঁড়িয়ে কিন্তু হঠাৎ ভয় হয়ে গেল তার।

কর্ণেল বর্ণনা করছিলেন কেসটা। এবার থামলেন একটু। তারপর বললেন, এটা অদ্ভুত হিউম্যান সাইকলজি। কুমারমঙ্গলম কোন দিন স্ত্রীজাতির প্রতি আসক্ত ছিল না। একমাত্র ধ্যানজ্ঞান ছিল টাকা। গুপ্টার লাসের কাছে দাঁড়িয়ে হঠাৎ তার প্রচণ্ড ভয় হল মিলিকে। এই যুবতী সুন্দরী মেয়েটি টাকার লোভে একদিন নির্দোষ নিরীহ একটি ছেলেকে গুলি করতে পেরেছিল। এবার অক্লেশে গুপ্টাকেও বিষ দিয়ে মারতে পারল। এর পর যদি কেউ ওকে কুমারমঙ্গলমকে খুন করতে বলে—সে চোখ বুঁজে তাই করবে—একটুও হাত কাঁপবে না। অতএব সে তীব্র ঘৃণায় উত্তেজিত হয়ে পড়ল। এ একটা হঠকারী সিদ্ধান্ত মাত্র। এটা খুবই স্বাভাবিক ছিল ওর পক্ষে। ও সুযোগ খুঁজল। মিলির হাতে তখনও মদের গ্লাস। মিলি নির্বিকার। ওর মতো ঠাণ্ডা আর নির্বিকার মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না। ও হাসতে হাসতে বলল—এবার তুমি মনের আনন্দে ফিল্ম করতে পারবে। অবনী ভরদ্বাজকে আমি আসতে বলেছি এখানে। ও আসুক। ও খুব প্রভাবশালী লোক। পুলিশকে ম্যানেজ করে দেবে। তারপর আমরা ফিল্ম প্রডিউস করব। তোমার তো অনেক টাকা এখন।

কুমারমঙ্গলম অমনি ভড়কে গেল আরও। নাঃ, এক্ষুনি পালাতে হবে এই ডাইনীর হাত থেকে। কিন্তু পালানোর আগে তাকে শেষ

করে যেতে হবে। সঙ্গে ছোরা ছিল। কিন্তু এ কাজে সে আনাড়ি। সে নার্ভও নেই। তখন ও চালাকি করল।—মিলি, আমার মনে হচ্ছে, কে যেন এসেছে বা আসছে। পায়ের শব্দ পেলুম। দেখে এস তো, মিঃ ভরদ্বাজ এলেন নাকি? মিলি ব্যস্ত হয়ে অপেক্ষা করছিল। বেরিয়ে গেল তক্ষুনি।

মদের গ্লাসটা রেখে গিয়েছিল মিলি। ছোরা মারার চেয়ে বিষ প্রয়োগ নিরাপদ নির্ঝঞ্ঝাট। কুমারমঙ্গলমের পকেটে পটাসিয়াম সাইনায়েডের পুরিয়া ছিল—যা থেকে খানিকটা সে মিলিকে আগে দিয়েছিল।

ব্যস, মিলি ফিরে এসে 'কেউ আসে নি' বলল এবং নির্দ্বিধায় নিজের গ্লাসে চুমুক দিল। বিছানাতে ঢলে পড়ল। বিছানাতে পা ঝুলিয়ে বসে চুমুক দিয়েছিল সে। তারপর······

তারপর কুমারমঙ্গলম ভাবল, সে এবার মুক্ত। কিন্তু পাপ নিজের অলক্ষ্যে ফাঁদে গিয়ে পড়ে এবং ধরা দেয়।······

কর্ণেল চুপ করলেন। চুরুট ধরালেন। তারপর জয়ন্তের দিকে তাকিয়ে বললেন—চলি, জয়ন্ত।

আস্তে আস্তে বেরিয়ে এসে কর্ণেল নীলাদ্রি সরকার রাস্তায় নামলেন। বুকে ক্রস এঁকে আকাশ দেখলেন। চমৎকার আজ মার্চের সকালবেলাটা। আস্তে আস্তে হাঁটিতে থাকলেন। এখন কিছুক্ষণ হাঁটতেই ভাল লাগবে।

হঠাৎ চোখে পড়ল একটা দোকানের সাইনবোর্ডের দিকে। থমকে দাঁড়ালেন। উজ্জ্বল সোনালী একটি নারীমূর্তি—আশ্চর্য সুন্দর শিল্প। গহনার প্রাচীন দোকান ওটা। কিন্তু ওই মূর্তিটা আসলে পেতলের। মনে পড়ল এক কবির কবিতার কিছু লাইন—"সোনার পিতলমূর্তি!" নারীর উদ্দেশ্যে লেখা।···

ঠিক তাই বটে। মিলি সেন ওরফে উর্মিমালা ছাড়া আর কে সে?

দ্বিতীয় পর্ব ঃ কাকচরিত্র

এক

পিকনিকে দুর্ঘটনা

অনেকদিন পরে কর্ণেল নীলাদ্রি সরকারের ইলিয়ট রোডের বাসায় গেলাম। বাড়িটার নাম 'সনি লজ'। পাঁচতলা নতুন একেলে স্থাপত্য। লিফট আছে। কর্ণেল থাকেন তিন তলায়—পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্তে।

কর্ণেলের বোন (সম্পর্কের ব্যাপারটা সম্প্রতি জেনেছি—আগে ভাবতাম নিতান্ত পরিচারিকা) প্রৌঢ়া মিসেস্ এ্যারাথুন দরজা খুলে হাসল।—এসো চাউড্রি। ছাখো গে, তোমাদের বুড়ো খোকাটির মাথা বিগড়ে গেছে। সকাল থেকে কাকের ওপর ক্ষেপে গেছে।

এ তামাসার কারণ বুঝতে পারি। কর্ণেল সরকারের হাবভাব চালচলন মিসেস্ এ্যারাথুনের পক্ষে রহস্যজনক বরাবর। সেটা অবশ্য স্বাভাবিকই। ষাট-পঁয়ষট্টি বয়সের এই বুড়োর বাতিক যত রাজ্যের খুনখারাবির পিছনে দৌড়াদৌড়ি। আমারই তো ভয় হয়, কবে কোন মারাত্মক ধূর্ত খুনীর পাল্লায় পড়ে বেঘোরে প্রাণটা না খুইয়ে বসেন।

অনুযোগ করলে কর্ণেল প্লেটোর 'ডায়ালোগ' বইটা খুলে সক্রেটিসের জীবন-মৃত্যুর বিষয়ে কিছু উক্তি পড়ে দেখতে বলেন। তারপর বলেন—কিন্তু তোমার, বুঝলে জয়ন্ত, তোমার এসব বলা সাজে না! তুমি তো খবরের কাগজের একজন নামকরা রিপোর্টার! তোমাকেও কি অনেক জায়গায় প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে হয় না?

এই বলে কর্ণেল তাঁর অতীত জীবনের ফিরিস্তি খুলতে থাকেন। আফ্রিকা আর বর্মায় ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর একজন কর্ণেল হিসেবে কতবার দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জার্মান আর জাপানীদের গুলি খেতে খেতে বেঁচে গেছেন, সেইসব রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কাহিনী।

মোটকথা কর্ণেল সরকার মানুষটি সত্যি বড় রহস্যময়। মিসেস্ এ্যারাথুন সাধারণ মহিলা—তার কাছে তো বটেই, আমার কাছেও মাঝেমাঝে ওঁর আচরণ বেশ অদ্ভুত লাগে।

সটান কর্ণেলের বেডরুমে চলে যাবার ধৃষ্টতা অন্যের হয় কী না জানি না, এই রিপোর্টার জয়ন্ত চৌধুরীর হয়। এই নাকগলানো অভ্যাস রিপোর্টারদের থাকে। যে যত বেশি নাকগলাতে পারে, সে ততো দক্ষ রিপোর্টার হতে পারে। আমাদের দৈনিক সত্যসেবকের চীফ রিপোর্টার প্রশান্তদার এই ভাষ্য।...

আজ ঢুকে গিয়ে দেখি, কর্ণেল দক্ষিণের জানলায় ঝুঁকে আমার দিকে পিছু ফিরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ভঙ্গীটা দেখে হাসি পেল। থমকে দাঁড়ালাম।

হঠাৎ কর্ণেল ওদিকে মুখ রেখেই বললেন—জয়ন্ত, কাককে তোমাদের হিন্দুশাস্ত্রে অমঙ্গলের প্রতীক কেন বলা হয় জানো ?

আমি তো থ। কর্ণেল কী ভাবে টের পেলেন যে আমিই এসেছি ! কাছাকাছি কোন আয়না নেই যে আমার প্রতিবিম্ব দেখতে পেয়েছেন।

কর্ণেল এবার ঘুরে বললেন—বসো। তোমার পায়ের শব্দ শুনেই বুঝতে পেরেছি।

—পায়ের শব্দ শুনে ? বলেন কী কর্ণেল ?

—ওটা অবাক হবার মতো কিছু নয় বাছা। নিতান্ত পর্যবেক্ষণের অভ্যাস। তবে সেই সঙ্গে তোমার পাইপের তামাকের গন্ধটা আমাকে বলে দিয়েছে। বসো।

বসলাম না। ওঁর পাশে গিয়ে জানলার বাইরে তাকালাম। নিচে একটা বস্তী এলাকা রয়েছে। তার মধ্যে অনেকগুলো গাছ আছে। নিম কৃষ্ণচূড়া শিমূল আর জামরুল। মধ্য কলকাতায় একটা পাড়াগাঁ রয়ে গেছে, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। নিমগাছটা প্রকাণ্ড। তার ডালপালা কালো করে বসে রয়েছে কয়েকশো কাক। তাই দেখেছিলেন তাহলে ! বললাম—কাক কিসের প্রতীক বলছিলেন যেন ?

—হুম্। অমঙ্গলের।…বলে কর্ণেল কোণের সোফায় বসে পড়লেন।—এস জয়ন্ত, আজ আমরা কাক নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা করি।

আমিও বসলাম। বসে বললাম—আপনাদের খ্রীষ্টিয়ান শাস্ত্রে কাক নিয়ে কোন প্রসঙ্গ নেই?

কর্ণেল বললেন—ঘেঁটে দেখিনি। কিন্তু যাই বলো জয়ন্ত, হিন্দুরা যে কাককে অমঙ্গলের সঙ্গে—অর্থাৎ 'এভিলের' সঙ্গে যুক্ত করেছেন—তার সঙ্গত কারণ আছে। ওঃ জয়ন্ত, যে কাকগুলো দেখলে এইমাত্র—আমাকে পাগল করে ছাড়লে! কী কর্কশ ডাক, কী চ্যাঁচামেচি সারাদিন!

হেসে বললাম—ওটা নিতান্ত কাকতালীয় ব্যাপার! আপনার ক্ষেত্রে।

—ঠিক বলেছ। কাকতালীয় যোগের কথাটা মাথায় আসেনি এতক্ষণ।…বলে উনি সোজা হলেন। চোখদুটো যেন জ্বলে উঠল। কর্ণেল বিড়বিড় করলেন আপন মনে—হাউ ফানি! ভুলেই গিয়েছিলাম। কাকতালীয় যোগ! ঠিক, ঠিক। দ্যাটস দা আইডিয়া।

অবাক হয়ে বললাম—কী ব্যাপার কর্ণেল?

কর্ণেল প্রশ্নে আমল না দিয়ে আমার দিকে নিষ্পলক চোখ তাকিয়ে বললেন—কাক এসে তালের ওপর বসল, ঠিক সেই মুহূর্তে তালটা পড়ে গেল। কেউ যদি তার থেকে ধরে নেয় যে কাকটা বসার দরুণ তালটা পড়ল, তাহলে সে নিশ্চয় ভুল করছে। অথচ ঠিক ওইরকম সিদ্ধান্তই আমরা নানা ব্যাপারে করে ফেলি। পরস্পর বিচ্ছিন্ন দুটো ঘটনা একত্র ঘটলে আমরা একটাকে আরেকটার কারণ বলে ধরে নিই অনেকক্ষেত্রে। আসলে তালটা পড়ার সময় হয়ে এসেছিল—কাকটা না এলেও পড়ত। তাই না জয়ন্ত?

—হ্যাঁ। সে তো বটেই। যেমন, আপনি তো কতদিন ধরে ওই জানালার বাইরে কাকগুলো দেখে আসছেন, নিশ্চয় আজকের মতো এমন বিরক্ত হননি, কিংবা কাক নিয়ে মাথা ঘামাননি। কাজেই কর্ণেল,

আজ যখন হঠাৎ কাক দেখে বিরক্ত হয়েছেন এবং আমি আসামাত্র কাকপ্রসঙ্গে প্রশ্নটা করে বসলেন, তখন আমিও এক্ষেত্রে ব্যাপারটা কাকতালীয় যোগ বলতে বাধ্য হয়েছি। অর্থাৎ আপনার বিরক্তিময় ভাবনার পিছনে অন্য ঘটনা আছে। তা নিতান্ত কাক নয়।

কর্ণেল একটু হাসলেন এবার।—রাইট, রাইট। তবে কী জানো জয়ন্ত, ভেবে দেখলাম কাকচরিত্র সত্যি বড় রহস্যময়। ভারতীয় পণ্ডিতরা কাকচরিত্র নিয়ে কেন মাথা ঘামাতেন, টের পাচ্ছি। আশা করি, 'কাকচরিত্র' নামে প্রাচীন তত্ত্বশাস্ত্র তোমার পড়া আছে।

—ভ্যাট্! সে সব গাঁজাখুঁরি ব্যাপার। আজকাল কেউ মানে না।

—সে আলাদা প্রশ্ন, কে মানে বা মানে না। কিন্তু কাক—ওঃ! হরিবল্!...আবার বিড়বিড় করে কী বলতে থাকলেন কর্ণেল।

সেই মুহূর্তে ঝট করে আমার মনে পড়ে গেল, আজকের কাগজের প্রথম পাতায় বারো পয়েন্ট বোল্ড হরফে ছাপা বক্স করা ছোট্ট খবরটা। পি টি আই-এর খবর। 'প্রখ্যাত শিল্পপতি শ্রীহিতেন্দ্র প্রসাদ সেন গত ২৩শে মার্চ তাঁর বিলাসপুরের বাগানবাড়িতে এক আকস্মিক দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। উড়ন্ত একঝাঁক কাক লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ার সময় দৈবাৎ তিনি গুলিবিদ্ধ হন।' খবরটা এত দেরী করে বেরনোর কারণ সম্ভবত পুলিশের বিধিনিষেধ।

কর্ণেলের সামনের টেবিলে একটা স্টেটসম্যান পড়ে ছিল। তক্ষুনি তুলে নিয়ে দেখি, ওঁরাও প্রথমপাতায় ছেপেছেন খবরটা—বক্স করেই। আর বক্সটা ঘিরে লাল পেন্সিলে দাগ দিয়ে রেখেছেন কর্ণেল। এই ব্যাপার তাহলে!

কর্ণেল আমার কাণ্ড দেখছিলেন চুপচাপ। তারপর বললেন—হুম্। তোমার উন্নতি হবে, জয়ন্ত। তোমার মন খুব দ্রুত কাজ করতে পারে।

—হিতেন সেন মারা গেছেন? কি কাণ্ড!...এই তো বিশে মার্চ পার্ক হোটেলে একটা কভারেজে গিয়েছিলাম। বিলাসপুরে একটা স্বদেশী মেলা বসাচ্ছেন—তারই প্রেস কনফারেন্স ডেকেছিলেন।

সর্বনাশ ! তাহলে তো আর মেলাটা হবে না।

—হুম্‌। হবে না। হয়তো হত—ওঁর স্ত্রীর উদ্যোগেই তো ব্যাপারটা হবার কথা ছিল। শ্রী সেন নিঃসন্তান। শ্রীমতী সেন—এসব ক্ষেত্রে যা হয়, সমাজসেবা ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। কিন্তু মেলাটা হচ্ছে না।

—কেন? অসুবিধা কিসের? সে তো এপ্রিলের মাঝামাঝি শুরু হবার কথা।

—হবে না। কারণ, শ্রী সেনের যে উইল বেরিয়ে পড়েছে—তাতে দেখা যাচ্ছে উনি সব স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মাত্র সিকিভাগ দিয়ে গেছেন স্ত্রী এবং অন্যান্য কিছু দুঃস্থ আত্মীয়কে, প্রত্যেকে সমান-সমান হিস্যা। বাকিটার অর্ধেক একটা আশ্রমের নামে, অর্ধেক কোন এক শ্রীমতী শ্যামলীর নামে।

—সে কী? ভারি অদ্ভুত ব্যাপার তো! কে সে?

—এই শ্যামলী নামে মহিলাটিকে তুমি চিনতেও পারো। অন্তত নাম শোনা উচিত। কারণ তুমি রিপোর্টার।

লাফিয়ে উঠলুম উত্তেজনায়।—কর্ণেল, কর্ণেল! ক্যাবারে গার্ল মিস শ্যামলি নয় তো?

কর্ণেল মৃদু হাসলেন।—দ্যাটস রাইট।

—মিস শ্যামলীকে হিতেন সেনের মতো লোক—ভ্যাট্‌! অসম্ভব!

কর্ণেল জোরে হেসে উঠলেন।—সম্ভব অসম্ভব সম্পর্কে যা শেষ কথা বলার, সেক্সপীয়ার বলে গেছেন বৎস জয়ন্ত। যাই হোক, আমার বিরক্তির হেতু কিংবা অস্বস্তির উৎস সেটা নয়। কোটিপতিরা অনেক ব্যাপার করেন—যা আমাদের মতো সাধারণ মানুষের কাছে নিশ্চয় উত্তেজনা সৃষ্টি করে। সেকালে রাজামহারাজা নবাববাদশারা এর চেয়ে অনেক বিস্ময়কর কাজ করতেন। বাদশা সাজাহানের কথাই ধরো। বউয়ের জন্যে তাজমহল নামে কী এলাহি কাণ্ড করে গেলেন! জয়ন্ত, ওসব ছেড়ে দাও। এস, আমরা কাক নিয়ে আলোচনা করি

—আর কাক !···বিরক্ত হয়ে বললুম।—আশ্চর্য কর্নেল! হিতেন সেন একটা ক্যাবারে নর্তকীকে অত সম্পত্তি দিয়ে গেলেন? ইস্, কোন মানে হয় এর?

—মাই ডিয়ার ইয়ং ম্যান, তুমি দেখছি নেহাৎ ছাপোষা মানুষের চোখে ব্যাপারটা দেখছ! ভুলে যাচ্ছ যে তুমি একজন সাংবাদিক। যেখানে-সেখানে অজস্র সম্পদের অপচয় তোমাদের তো চোখে পড়ার কথা। সামাজিক বৈষম্যের বাস্তব নিদর্শন চারপাশে এত বেশি যে ও নিয়ে নতুন উত্তেজনা প্রকাশ করা বৃথা। তুমি রাজনৈতিক নেতা বা কর্মী নও, আমিও নই। তুমি-আমি সমাজের উন্নতি বা সাম্য আনবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠিনি। বলতে পারি বড়জোর—উই হ্যাভ দা ফিলিংস, উই আর কনসাস এ্যাবাউট দা রিয়্যালিটি। কিন্তু আমরা এ ব্যাপারে নিতান্ত অসহায়। যাই হোক, আমি একজন অপরাধ-বিজ্ঞানী এবং তুমি একজন রিপোর্টার হিসেবে এ মুহূর্তে শুধু ওই অমঙ্গলের প্রতীক কালো রঙের পাখি সম্পর্কে কিছু করতে পারি কিনা দেখা যাক।

একটু হাসতে হল।—কাক নিয়ে কী করতে চান?

—সত্যে পৌঁছতে।

—তার মানে?

—একটু আগে আমরা কাকতালীয় যোগের কথা বলছিলাম, জয়ন্ত। তাই না?

—হ্যাঁ, বলছিলুম তো।

—এ্যারাথুন, ডার্লিং!···কর্নেল ডাকলেন।—আমাদের একপট কফি দিলে ধন্য হই।

মিসেস এ্যারাথুন নিশ্চয় আলাদিনের পিদীম পেয়েছে। বলতে না বলতে নিঃশব্দে ট্রেতে কফির পট, কাপ আর একটা স্ন্যাকসের প্যাকেট রেখে চলে গেল। কর্নেল তার উদ্দেশ্যে কতগুলো মিষ্টি বাক্য উৎসর্গ করে বললেন—কফি বানাও, জয়ন্ত।

কফির পেয়ালা হাতে না পাওয়া অব্দি মুখ খুললেন না কর্নেল।

একটা চুমুক দিয়ে বললেন—হিতেন সেনের মৃত্যুর ব্যাপারে তোমার কোন বিস্ময় জাগছে না ?

—না তো। উড়ন্ত কাক মারতে বন্দুক তুলেছিলেন, হয়তো পোষাকে কিংবা অন্য কিছুতে লেগে নলটা যথেষ্ট ওপরে ওঠবার আগেই ট্রিগারে চাপ পড়েছিল—এ্যাকসিডেন্ট হয়ে গেছে। এ তো খুবই স্বাভাবিক। আমার বিস্ময় জাগাচ্ছে উইলে মিস শ্যামলীকে—

বাধা দিয়ে কর্ণেল বললেন—হুম্, এ্যাকসিডেন্টের বর্ণনাটা অবিকল তোমার ধারণার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে জয়ন্ত। পুলিশের রিপোর্ট এবং বিলাসপুর বাগানবাড়িতে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের সকলের বর্ণনা ওইরকম। কিন্তু কাক আমাকে জ্বালাচ্ছে সারাক্ষণ।

—কেন ?

কর্ণেল উত্তেজিত হলেন যেন।—মাই ডিয়ার জয়ন্ত, এটা কেন তোমার কাছে অদ্ভুত মনে হচ্ছে না যে হিতেন সেন কাক মারতে বন্দুক তুলেছিলেন ? আর কিছু নয়—স্রেফ কাক ? হিতেন সেন মোটামুটি ভালো শিকারী ছিলেন, আমি জানি। বয়সেও এমন কিছু বুড়ো হননি। মাথাও ছিল পরিষ্কার। কোন অসুখ-বিসুখ ছিল না। ওষুধ খাওয়ার বাতিক ছিল না। কোন রকম এ্যালোপ্যাথি ওষুধ জীবনে খাননি। বড়জোর হোমিওপ্যাথি খেতেন। তাও কদাচিৎ। তা—একজন ধুরন্ধর, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, ঝানু ব্যবসায়ী মানুষ হিতেন সেন—আর কিছু পেলেন না, কাক মারতে গেলেন ?

—হয়তো ওখানে কাকের ভীষণ উপদ্রব আছে। ওই তো দেখুন না, অতসব কাক নিমগাছটাতে রয়েছে। আমারই বিরক্ত লাগছে দেখে। হয়তো হিতেন বাবুও ওদের চ্যাঁচামেচিতে বিরক্ত হয়েছিলেন। তাই…

—জয়ন্ত, জয়ন্ত ! বুদ্ধির সামনে থেকে ঘষা কাঁচটা সরিয়ে ফেলো।

—কেন কর্ণেল ?

—কাক বিরক্তির কারণ নিশ্চয়। কিন্তু তার জন্যে কেউ তাদের

তাড়াতেই চাইবে—মেরে ফেলতে নয়। অন্তত যদি সে বদ্‌রাগী লোক না হয়। হিতেন সেন মোটেও বদরাগী গোঁয়ার-গোবিন্দ বা হঠকারী বুদ্ধির লোক ছিলেন না। ধরে নিচ্ছি, তিনি বন্দুকই ছুঁড়েছিলেন কাক তাড়াতে—কিংবা আরও এগিয়ে ধরে নিচ্ছি, কাক মারতেই চেয়েছিলেন। কিন্তু ছররা নয় কেন? কেন সাংঘাতিক বিপজ্জনক একটা বুলেট ব্যবহার করে বসলেন? এবং ভেবে ছাখো—বন্দুক নয়, নিতান্ত শটগান নয়—একেবারে ওঁর উইনচেষ্টার রাইফেল হাতে নিলেন!

—তাও তো বটে। পুলিশের কোন সন্দেহ হয়নি এতে?

—কেমন করে হবে? সবাই বলছে এবং তাছাড়া পুলিশ তদন্ত করে প্রমাণ পেয়েছে ওই রাইফেলটা ছাড়া আর কোন অস্ত্র হিতেনবাবুর বাগানবাড়িতে ওই সময় ছিল না। রিপোর্ট বলছে, বাগানবাড়িতে প্রাঙ্গণের শেষদিকে সন্ধ্যার একটু আগে গাছপালার ছায়ায় সুদৃশ্য তাঁবু খাটিয়ে পিকনিক মতো করা হয়েছিল। উনুন এবং খাবারদাবার ছিল গাছের নিচে। কাকগুলোর তখন গাছে বসার সময়। তাই বারবার বিরক্ত করছিল। খাবারে পায়খানা করে দিতে পারে—সেই আশঙ্কায় সবাই মিলে অনেকবার ঢিল ছুঁড়ে তাড়া করেছিল। তারপর অবশেষে হিতেনবাবু রেগেমেগে রাইফেলটা নিয়ে বেরিয়ে আসেন। সেইসময় কাকগুলো আচমকা মাথার ওপর থেকে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে উড়তে শুরু করে। পিছন পিছন একা দৌড়ে যান হিতেনবাবু। বাগানের ঘন ঝোপঝাড়ের আড়ালে তাঁকে আর দেখা যায় না কতক্ষণ। পিছনে ওই দিকটায় কোন বসতী নেই। জঙ্গল আর আখের ক্ষেত আর একটা ছোট নদী রয়েছে। পাঁচিল ওদিকে গত বন্যায় ধ্বসে গিয়েছিল। মেরামত এখনও হয়নি। নদী থেকে ভাঙা পাঁচিলের মধ্যে ঢালু কুঁড়িগজ জঙ্গলে জায়গার ঠিক মাঝামাঝি পড়েছিলেন হিতেনবাবু। গুলি লেগেছে চিবুকের নীচে, গলার ওপর অংশে—ডানদিকে। গুলি সোজা মগজে গিয়ে ঢুকেছে। ইতিমধ্যে মিনিট দশ—কারো মতে মিনিট পনের পরে ওদিক থেকে গুলির আওয়াজ শোনা

যায়। হিতেনবাবুর ফেরার নাম নেই। হ্যাসাগ জ্বালানো হয়েছে ইতিমধ্যে। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা সাতটা বেজে যায়। তখনও উনি ফেরেন না। সাড়ে সাতটায় মিসেস সেন উদ্বিগ্ন হয়ে খুঁজতে পাঠান। একজন চাকর সঙ্গে নিয়ে যান হিতেনবাবুর এ্যাটর্নী মিঃ সুশান্ত মজুমদার। ওঁরা হিতেনবাবুকে আবিষ্কার করেন। টর্চ ছিল দুজনেরই হাতে। অবশ্য পূর্ণিমার রাত ছিল। প্রতি বছর চৈত্রের দোল পূর্ণিমার রাতে বিলাসপুর বাগানবাড়িতে পিকনিক করা অভ্যাস ছিল হিতেনবাবুর। জয়ন্ত, সমস্ত ব্যাপারটা বিচার করে আমার ধারণা হয়েছে, পুলিশ এবং হিতেনবাবুর আত্মীয়স্বজনের সিদ্ধান্তটা যেন কাকতালীয়। তুমি কী বলো ?

—হুঁ, কী রকম যেন খাপছাড়া মনে হচ্ছে। অবশ্য মিস শ্যামলীর সম্পত্তিলাভের ফলে আমাদের প্রেজুডিসড্ হয়ে পড়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। এই অঘটনটা হিতেনবাবু না ঘটিয়ে গেলে তাঁর মৃত্যু দুর্ঘটনা বলেই চালানো যেত।

—তোমার কথা অস্বীকার করছি না। পুলিশও পরে একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেছে। উইলটা ওদের ধাঁধায় ফেলেছে। কিন্তু এদিকে তো মৃতদেহ আর হাতে নেই যে ফের পরীক্ষা করে দেখবে। ইতিমধ্যে সেটা ভস্মীভূত।

—মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে পুলিশ নিশ্চিত তো ?

—হ্যাঁ, অবশ্যই। ওই রাইফেল থেকেই গুলি বেরিয়ে মাথায় ঢুকেছে। রাইফেলের বাঁটে হিতেনবাবু ছাড়া অন্য কারো আঙুলের ছাপ পাওয়া যায়নি। কোন উল্টোপাল্টা সাক্ষ্যও কেউ দ্যায়নি। আবার কোন প্রত্যক্ষদর্শীও ছিল না।

উদ্বিগ্ন মুখে বললুম—কর্ণেল ! তাহলে কি এটা খুনের ঘটনা বলে আপনি নিঃসংশয় ?

কর্ণেল হাত তুলে বললেন—না, না জয়ন্ত। আমি ঠিক তা বলতে চাইছি না। কোন নিঃসংশয় সিদ্ধান্তেও আমি পৌঁছইনি। শুধু বলতে চাচ্ছি যে হিতেন সেনের আকস্মিক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর পট-

ভূমিকা আমার কাছে যুক্তিসিদ্ধ মনে হচ্ছে না। আগেই বলেছি—দুটো ব্যাপার আমার ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না। এক : হঠাৎ ভদ্রলোকের কাকের ওপর ক্ষেপে গিয়ে পিছনে দৌড়নো, দুই : বুলেটভরা রাইফেল হাতে নেওয়া।

—কিন্তু সাক্ষীরা তো বলছেন, তাই দেখেছেন।

—হ্যাঁ, দেখেছেন এবং বলেছেন একবাক্যে।

—তাহলে ?

কর্ণেল টাকে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন—ডার্লিং! তুমি তো দর্শনের ছাত্র ছিলে। অবভাসতত্ত্ব সম্পর্কে তুমি অজ্ঞ নও। প্রকৃত বস্তু এবং প্রতীয়মান বস্তু অর্থাৎ রিয়েলিটি ও এ্যাপিয়ারেন্সের বিষয় কি নতুন করে বোঝাতে হবে তোমাকে ? রেল লাইনে দাঁড়িয়ে দূরের দিকে তাকালে মনে হয়, দুটো লাইন ক্রমশ দিগন্তে গিয়ে মিশে গেছে পরস্পর। কিন্তু বস্তুত—আমরা জানি, ওরা বরাবর সমান্তরাল। হিতেন সেন কাকের ওপর রেগে গিয়ে গুলিভরা রাইফেল হাতে দৌড়ে গেলেন এবং পরে গুলির শব্দ শোনা গেল। এবং ঠিক গলার নিচে গুলি ঢুকে মগজ ফুঁড়ল। একই রাইফেলের গুলি—ছটার মধ্যে একটা খরচ হয়েছে, পাঁচটা ঠিকঠাক কেসে রয়েছে। এবং আছাড় খাওয়ার চিহ্নও রয়েছে শরীরে। রাইফেলে ওঁর আঙুলের ছাপ ছাড়া কোন ছাপ নেই। সব—সবকিছু আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি—খুব স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। মিস শ্যামলীকে বিশাল সম্পত্তি দেওয়াটা আমি ছেড়ে দিলাম। কিন্তু এটা বাদ দিয়েও যে ঘটনাটা দাঁড়ায় অর্থাৎ দুর্ঘটনায় মৃত্যু, সেটা নিছক এ্যাপিয়ারেন্স বা প্রতীয়মানও তো হতে পারে! ধরো—যদি মিস শ্যামলী উইলে নাও থাকতেন, মিসেস সেনই সব সম্পত্তি পেতেন—তবেও ব্যাপারটা কি তোমার রিয়্যাল ইনসিডেণ্ট বলে মনে হচ্ছে জয়ন্ত ?

—ঠিকই বলেছেন।

—কেন হিতেন সেন হঠাৎ কাকের ওপর ক্ষেপে গেলেন ?

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থেকে বললুম—তাইতো! কেন ?

—কেনই বা উনি গুলিভরা রাইফেল নিয়ে দৌড়ে গেলেন ?

—হ্যাঁ। কেন গেলেন ?

কর্ণেল খপ করে আমার হাত ধরে বললেন—ওঠ, বেরিয়ে পড়ি।

দুই

॥ মিস শ্যামলী ও একটি ফুল ॥

আমার গাড়িটা ফিয়াট। স্টিয়ারিং আমারই হাতে। কিন্তু কোথায় যেতে হবে, কর্ণেল বলছেন না। দু'একবার প্রশ্ন করেও কোন স্পষ্ট নির্দেশ পাইনি। কর্ণেল চোখ বুজে ঝিমোতে ঝিমোতে শুধু বলছেন—চলো তো!

গাড়ি পার্ক স্ট্রিটে ঢুকিয়েছি। ছুটির দিন রোববার। বেলা প্রায় নটা—এখনও অবশ্য ভোঁ বাজেনি। কিন্তু এ এক বিদঘুটে অবস্থায় পড়া গেল দেখছি। অন্ধের মতো চলেছি যেন। চৌরঙ্গীর মোড়ে একটা খালি লরী ঢনঢন করে আমাদের প্রায় গা ঘেঁষে এবং বেআইনী-ভাবে ওভারটেক করে আচমকা সামনে দাঁড়িয়ে গেল—রোড সিগনাল লাল। ঢুঁ মারতে গিয়ে সামলে নিল আমার ক্রিমরঙা ফিয়াট। আমি লরীর শূন্য খোলটার উদ্দেশ্যে খুব চ্যাঁচামেচি করলুম। কর্ণেল আচমকা ব্রেক কষার ঝাঁকুনিতে চোখ খুলেছিলেন—বন্ধ করলেন ফের। আলো সবুজ হলে অসভ্য লরীটাকে ডিঙিয়ে যাবার জন্যে বাঁদিকে মোড় নিলাম। পিছনের গাড়িগুলোর খিস্তি এবার আমাকে শুনতে হল। চৌরঙ্গী ধরে দক্ষিণে যাবার সময় কর্ণেল যেন নিজের মনে বললেন—ঠিকই যাচ্ছি।

বাঁদিকে থিয়েটার রোডে ঢুকলুম। কর্ণেলের কোন সাড়া নেই। আচ্ছা মুশকিলে পড়া গেল তো! আমি যেদিকে খুসি গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতলব করলুম—তার ফলে দেখা যাক, কর্ণেল বাধ্য হয়ে গন্তব্যস্থান বলে বসবেন নাকি।

খানিক এগিয়ে বাঁদিকে ছোট রাস্তায়, আবার বাঁদিকে ছোট রাস্তায়—তারপর বোঁও করে ঘুরে ক্যামাক স্ট্রীট, তারপর সামনের

ছোটরাস্তায়। প্রচণ্ড হাসি পাচ্ছে। কর্নেল এবার নির্ঘাৎ জব্দ হচ্ছেন।

কিন্তু একজায়গায় হঠাৎ কর্নেল বলে উঠলেন—রোখো, রোখো!

গাড়ি দাঁড় করালুম। পুরো সাহেবপাড়া এটা। উঁচুতলার সাহেবসুবোরা বিশাল সব বাড়িতে এখানে বাস করেন। পাঁচিল, গেট, প্রাঙ্গণ, গাছপালা, সুইমিং পুল, ভাস্কর্য ইত্যাদি প্রতিটি বাড়ির বৈশিষ্ট্য। বাঁদিকে একটা গেট। কর্নেল দেখলাম দরজা খুলে নামলেন। তারপর আমার দিকে না ঘুরে গেটে চলে গেলেন। উর্দিপরা দারোয়ানকে কী বললেন। দারোয়ান সেলাম করে গেটটা পুরো খুলে দিল। কর্নেল আমার দিকে হাত নেড়ে ভিতরে গাড়ি নিয়ে যেতে ইসারা করলেন।

গাড়িতে আর চাপলেন না। পাশে পাশে এগিয়ে গেলেন উনি! লনের একপাশে তিনটে দেশী বিদেশী সুদৃশ্য গাড়ি দাঁড় করানো রয়েছে। লনে গাড়ি রেখে বেরিয়ে এলুম। সামনে দেখি একটা স্কাইক্র্যাপার বাড়ি। চারপাশের বনেদী ঐতিহ্যের ওপর আধুনিক স্থাপত্যের টানা একফালি হাসি যেন—হাসিটা অতি উদ্ধত। কর্নেল আমাকে মুখ তুলে বাড়ির উচ্চতার দিকে তাকাতে দেখে বললেন—একালের সুরসুন্দরীদের পক্ষে উপযুক্ত জায়গা, ডার্লিং!

কর্নেল স্ত্রীপুরুষ নির্বিচারে ডার্লিং সম্বোধন করেন। আমি বললুম—কিন্তু কর্নেল, আমরা কার কাছে যাচ্ছি? কোন সুরসুন্দরীর কাছেই কি?

পরক্ষণে আমার ধাঁধা ঘুচে গেল আচমকা। আরে তাই তো! এখানেই তো সেই ক্যাবারে নর্তকী মিস শ্যামলী থাকে! একটা সিনেমা-মাসিকে শ্যামলী সম্পর্কে কিছু মুখরোচক রেপোর্টাজ পড়েছিলাম বটে! অনেক অবান্তর বিষয় স্মৃতিতে আমরা দুর্জ্ঞেয় কারণে রেখে দিই। মধ্য কলকাতায় এই 'ইন্দ্রপুরী' এবং মিস শ্যামলীর সেখানে অবস্থান অকারণে স্মৃতিতে স্পষ্ট ছিল।

কর্নেল আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে অন্তরঙ্গভাবে একটা হাত ধরলেন। দুজনে এগিয়ে গেলুম।

উদ্দেশ্যহীনভাবে অন্ধের মতো গাড়ি চালিয়ে শ্যামলীর ফ্ল্যাটে

পৌঁছনো নিতান্তই আকস্মিক ঘটনা ছাড়া কী বলব? এখানে আসবার মতলব মোটেও আমার ছিল না। লিফটের সামনে একটু দাঁড়িয়ে কর্ণেল মুচকি হেসে বললেন,—তোমার উন্নতি হবে, জয়ন্ত। ঠিক জায়গায় নিয়ে এসেছে।

হেসে বললুম—মোটেও তা নয়, কর্ণেল। আমি নির্দিষ্ট কোথাও আপনাকে পৌঁছে দেবার জন্মে আসছিলুম না। এটা নেহাৎ আকস্মিক ঘটনা। আপনি গন্তব্যস্থানের কথা একবারও বললেন না। ফলে, উদ্দেশ্যহীন ভাবে গাড়ি চালাচ্ছিলুম।

—না বাছা! মোটেও তা নয়। আমি 'চলো তো' বলার সঙ্গে তুমি ঠিক করে নিয়েছিলে এমন একটা গন্তব্য-স্থান—যা আমাদের কেসের পক্ষে খুবই জরুরী।

—বারে! আমি বলছি তো, উদ্দেশ্যহীনভাবে এসে পড়েছি দৈবাৎ।

—না, না।...বলে কর্ণেল লিফটের চাবি টিপলেন। লিফটা ওপরতলায় ছিল।- জয়ন্ত, এই হচ্ছে মানুষের মনের রহস্য। যখনই তোমাকে 'চলো তো' বললুম এবং নির্দিষ্ট জায়গার নাম করলুম না, অমনি তোমার অবচেতনায় লক্ষ্যের কাঁটা মিস শ্যামলীর দিকেই প্রথমে নির্দিষ্ট হল। এই কেসে শ্যামলীকেই তুমি আগাগোড়া 'ভাইটাল' ধরে নিয়ে বসে আছো। সচেতন মনে যেহেতু যুক্তির দৌরাত্ম্য এবং কড়াকড়ি বেশি, তোমার অবচেতন মনের উদ্দেশ্যটা লুকোচুরি খেলতে আরম্ভ করল। তার ফলে যেটুকু পথ এলোমেলো গাড়ি চালিয়েছ—সবটাই তোমার সচেতন মনকে ভাঁওতা দিতে। নিজের সঙ্গে মানুষ এই ভাবেই লুকোচুরি খেলে।

গুম হয়ে রইলুম। লিফট এসে গেল। অটোমেটিক লিফট। ভিতরে ঢুকে কর্ণেল ছ নম্বর বোতাম টিপতেই দরজা বন্ধ হল এবং উঠতে শুরু করল। সাততলায় লিফট থেকে নামলুম আমরা। শ্যামলীর ফ্ল্যাট নম্বর আমি জানি না। শুধু জানি এই বাড়ীতে সে থাকে।

কর্ণেল, আশ্চর্য, ফ্ল্যাট নম্বর জানেন দেখছি! তিন নম্বর ফ্ল্যাটের

দরজায় বোতাম টিপলেন। কোন নামফলক নেই। না থাকাই স্বাভাবিক।

ভিতরে পিয়ানোর বাজনার মতো মিঠে টুং টাং শব্দ হল। আমি চাপা গলায় বললুম—আপনি ওকে চেনেন নাকি?

কর্ণেল জবাব দিলেন না। দরজার ফুটোর কাঁচে একটা চোখ আবছা ফুটে উঠল। তারপর খুলে গেল। স্বপ্নে শিউরে উঠলুম যেন। সেই শ্যামলী! যার বিলোল নাভিতরঙ্গ দেখে আমার এক কবিবন্ধু তেত্রিশটা পদ্য লিখে ফেলেছে এবং পত্রিকায় ছাপিয়েও নিয়েছে। মধ্যরাতে চৌরঙ্গী এলাকার হোটেলের মঞ্চে রহস্যময় আলোয় পিছলে বেড়ানো অপার্থিব একটুকরো মাংস—যা যৌনতার পোষা অন্ধ গণ্ডারটা ছেড়ে দিয়ে পুরুষগুলোকে এফোঁড় ওফোঁড় করে ফেলে, সেই মাংসের টুকরোটা এখন স্নিগ্ধ এবং পার্থিব দেখাল।

আর মিস শ্যামলী এখন গৃহস্থকন্যার মতো আটপৌরে বেশভূষায় এত সাধারণ যে 'শ্যামবাজারের শশীবাবুর' মেয়ে বলেও চালিয়ে দেওয়া যায়। কর্ণেলকে দেখেই তার মুখ যেন খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। —আসুন, আসুন! ডাকল সে। এবং আমার দিকেও অমায়িক দৃষ্টিতে তাকিয়ে হেসে বলল—আসুন, ভেতরে আসুন!

কর্ণেলের পিছনে পিছনে অবাক হয়ে ঢুকলুম। ঘরের ভিতর ঐশ্বর্য আর রুচির ছাপ রয়েছে। প্রকাণ্ড ড্রয়িংরুম। ঠিক মাঝখানে সোফাসেট এবং মেঝেয় সুরম্য কার্পেটে গীটার, পাখোয়াজ ইত্যাদি পড়ে রয়েছে। একদিকের দেওয়ালে কমপক্ষে ছফুট-চারফুট আকারের একটা বিশাল পোর্ট্রেট। দেখেই চিনলুম—হিতেন সেন!

আমরা দুজনে শোফায় বসলাম। শ্যামলী মেঝেয় পা দুমড়ে গ্রাম্য তরুণীর মতো বসল। হাসিমুখে আমার দিকে কটাক্ষ করে বলল—এঁকে কোথায় দেখেছি মনে হচ্ছে!

কর্ণেল বললেন—হুঁউ! দেখা স্বাভাবিক। ও সর্বচর। জয়ন্ত চৌধুরী—দৈনিক সত্যসেবকের রিপোর্টার। জয়ন্ত, শ্যামলীকে তোমার বিলক্ষণ চেনা আছে।

পরস্পর নমস্কার করলুম। শ্যামলী হাসতে হাসতে বলল—সর্বনাশ! রক্ষে করুন কর্ণেল! খবরের কাগজে যথেষ্ট হয়ে গেছে। আমি তো দারোয়ানকে বলে রেখেছি—প্রেসের লোক জানতে পারলে যেন……

কথাটা অসমাপ্ত রেখে সে ফের আমার দিকে কটাক্ষ করল। কর্ণেল বললেন—না না, ও আমার সঙ্গে এসেছে। তা ছাড়া তোমার ব্যাপারেও আমার ডানহাত এখন। জয়ন্ত খুব বুদ্ধিমান ছেলে। খুব ইয়ে। তা, যাই হোক, শ্যামলী, শোন--যেজন্যে এলাম। কাল রাতে তুমি তো আমার ওখান থেকে চলে এলে। আমার ঘুম হল না আর। তোমাকে ফোন করলুম ঘণ্টাখানেক পরে—পৌঁছলে কি না জানতে। কিন্তু তোমার লাইনটা মনে হল ডেড। ভাবলুম, কলকাতার টেলিফোনের ব্যাপার! সকালে ফোন করলুম—একই অবস্থা! তখন ভাবছিলুম, একবার যাবো নাকি। তুমিও রিং করছনা কথামতো। একটু উদ্বিগ্ন হলুম। সেই সময় জয়ন্ত এল। তখনি বেরিয়ে পড়লুম।

শ্যামলীর মুখটা গম্ভীর দেখাল।—কী জানি কী হয়েছে ফোনের। কাল রাত থেকে ডেড ছিল।

—গোটা বাড়ীর লাইন ডেড ছিল নাকি গতরাতে?

—না তো! আমারটা এক্সটেনসান লাইন। খালি আমারটা ডেড ছিল। এখন ঠিক হয়ে গেছে।

—কোন ফ্ল্যাটেই কারো নিজস্ব ডিরেক্ট লাইন নেই?

—জানি না। আছে নিশ্চয়। আমাকেও ডিরেক্ট নিতে হবে দেখছি। প্রাইভেসি রাখা মুসকিল হচ্ছে।

—যাক্ গে। কাল রাত থেকে এখন অব্দি তোমার দেবার মতো খবর থাকলে বলো।

—তেমন কিছু তো…

—আজ সকালে কেউ আসেনি?

—এসেছিল। সে আমার প্রফেশানের ব্যাপারে'

—ওঁদের কেউ আসেনি ?

—নাঃ। আর কেউ আসেনি। এলেও আমি বলে দিতুম—না, সম্ভব নয়। উইল ইজ উইল। আমি আমার লিগাল রাইটের সীমানা এক পাও পেরোতে চাইনে।

—মিসেস সেন আমাকে রিং করেছিলেন আজ সাড়ে সাতটায়।

শ্যামলী চমকে উঠল।—মিসেস সেন! চেনেন নাকি আপনাকে!

—না। কেউ পরামর্শ দিয়ে থাকবে। তবে তুমি ভেবো না ডার্লিং, আমি সবসময় সত্যের পক্ষে।

শ্যামলী উদ্বিগ্ন মুখে বলল—আচ্ছা কর্ণেল, সত্যি কি আমাকে এখন কিছুদিন সাবধানে থাকতে হবে? কোথাও ফাংশান করা যাবে না?

—মানুষের এই পৃথিবীটা খুব জটিল, শ্যামলী।

—কিন্তু অতসব কনট্র্যাক্ট রয়েছে। আমাকে তো তা মিট আপ করতেই হবে। তা না হলে পার্টিরা ক্ষতিপূরণ দাবী করে বসবে।

কর্ণেল হাসলেন—তুমি এখন কলকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনবতী মহিলা, মাই ডিয়ার গার্ল!

শ্যামলী চিন্তিতমুখে কী ভেবে তারপর ম্লান হেসে বলল—কিন্তু আমি এখনও আত্মরক্ষার কোন ব্যবস্থাই করিনি। যে কেউ যখন খুশি এসে আমাকে মেরে রেখে যেতে পারে।

কর্ণেল সশব্যস্তে বললেন—না, না। তোমাকে কেউ দৈহিক দিকে হামলা করবে—আমি মোটেও তা বলিনি শ্যামলী।

—তাহলে সাবধানে থাকার কথা বললেন কেন?

কর্ণেল ওর দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাকিয়ে বললেন—তুমি যথেষ্ট কোমল হৃদয় বিশিষ্ট মেয়ে। আমার ভয় সেখানেই। তোমাকে সহজে কেউ কনভিনস করতে পারে।

শ্যামলী আশ্বস্ত এবং আনন্দিত মুখে বলল—মোটেও না। আমি খুব—খু-উব—ভীষণ কোল্ডব্লাডেড। আমার হৃদয়-টিদয় মোটেও নরম নয়। অনেক তেঁতো অভিজ্ঞতার মধ্যে আমি বড় হয়েছি

কর্ণেল, ভুলে যাবেন না। বললুম তো—উইল ইজ উইল।

—যাক্ গে, শোন। মিসেস ফোন করে বলেছিলেন, তাঁর কিছু কথা আছে আমার সঙ্গে। খুলে কিছু বলেন না। ঠিক দশটায় যাবার কথা দিয়েছি। যাচ্ছি। তার আগে তোমাকে কিছু প্রশ্ন করতে এলুম। এগুলো গতরাতে আমার মাথায় আসেনি।

—বেশ তো, বলুন।

—হিতেনবাবু ২৩শে মার্চ সকালে তোমাকে ফোন করে বিলাসপুর যেতে বলেছিলেন। কিন্তু তুমি যাওনি। কারণ, ফোনে কোন অচেনা লোক তোমাকে শাসিয়েছিল যে গেলে বিপদ হবে। তাই না?

—হ্যাঁ। আপনাকে তো বলছি···

—কিন্তু তুমি কি সেজন্যই যাওনি? নাকি—কেউ না শাসালেও তুমি যেতে না?

শ্যামলী নাকের ডগা খুঁটে জবাব দিল—ঠিক বলছেন। আমি যেতুম না।

—কেন?

—আমাকে প্রথমত ভীষণ অবাক লেগেছিল। ওভাবে পাবলিক্‌লি মিঃ সেন আমার সঙ্গে মেলামেশা করবেন—বিশেষ করে ওঁর স্ত্রীর সামনে, আত্মীয়স্বজনও থাকবেন—তাঁদের সামনে! এটা অস্বস্তির কারণ হত আমার পক্ষে।

—কিন্তু মিঃ সেন তোমার সঙ্গে কখনও, মানে—কোন রকম অভব্য আচরণ করেননি!

—না। তা করেননি। খুব দূরত্ব রেখেই মিশতেন। আমিও খুব সমীহ করে চলতুম। তাহলেও তো আমি আসলে একজন ক্যাবারে গার্ল।

—কেন যেতে বলছেন, জিজ্ঞেস করেছিলে?

—হ্যাঁ। বলেছিলুম—আমি কী করব ওখানে গিয়ে?

—উনি কী বলেছিলেন?

—খুলে কিছু বলেননি। শুধু বলেছিলেন যে আমার পক্ষে ওখানে উপস্থিত থাকা জরুরী। কেন জরুরি তা জানতে চাইলেও বলেননি।

—হুম্! কিন্তু ওর মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পর ২৪শে মার্চ সকালে তুমি বিলাসপুর চলে গিয়েছিলে। এবারেও অজানা কেউ ফোনে তোমাকে মিঃ সেনের দুর্ঘটনার খবর দিয়েছিল। যাই হোক, বিলাসপুর যাবার কারণ কী শ্যামলী? মিঃ সেনের দুর্ঘটনা না ছবির সুটিং?

—বলেছি তো! যাওয়াটা আকস্মিক। সিনেমা পরিচালক অতীন্দ্র বসুর নতুন ছবিতে আমি একটা রোল করছি। উনি ওইদিন সকালে এসে হাজির। আউটডোর সুটিং-এ যেতে হবে এখুনি। আমি জানতুম না। বিলাসপুরেই ওর লোকেশান। হিরো পার্থকুমার অলরেডি চলে গেছে। তাই গিয়ে পড়লাম যখন, তখন এক ফাঁকে খোঁজ নিয়ে অতীন্দ্রবাবু আর আমি মিঃ সেনের বাগানবাড়িটা একবার ঘুরে এসেছিলুম। নিছক একটা কৌতূহল। আর ফুলটা তো তখনই কুড়িয়ে পাই!

—ফুলটা যেখানে পড়েছিল, তুমি শুনলে যে ডেডবডিটা ওখানেই ছিল। কেমন?

—হ্যাঁ। একটু কৌতূহলী হয়েছিলুম, ফুলটার বোঁটায় চুল জড়ানো দেখে। অতীন্দ্রবাবু ওটা রাখতে পরামর্শ দিলেন। ওঁর পরামর্শেই আপনার কাছে গিয়েছিলুম তাও বলেছি আপনাকে।

—তখনও তুমি উইলের ব্যাপারটা জানতেনা বলেছ!

—বলেছি। জানলুম কলকাতায় ফিরে—সন্ধ্যাবেলা। উকিল সুশান্তবাবু এলেন আমার এখানে। বললেন—সুখবর আছে। তারপর আমি তো হতভম্ব। তখন…

—শ্যামলা, মিসেস সেনের সঙ্গে তোমার আলাপ ছিল—নাকি এ্যাটর্নি চলে যাবার পর সেইই প্রথম এলেন?

—সেই প্রথম। এসে একচোট শাসালেন। তারপর লোভ দেখাতে লাগলেন। আপোষ করার কথা তুললেন। বললেন কতটা নগদ পেলে আমি আমার অংশ ছাড়তে রাজী ইত্যাদি।

—নিশ্চয় তুমি ওকে ফুলের কথা বলোনি ?

—মোটেও না। আমি আপনার কাছে যাবার জন্য ব্যস্ত।

—মিসেস সেনের মুখের আধখানা ঢাকা ছিল বলেছ।

—হাঁ, কালো তাঁতের শাড়ির ঘোমটা পরা ছিল। আমি তাতে অবাক হইনি। কারণ, মিঃ সেনই একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন যে ওঁর স্ত্রীর মুখের একপাশটা এক দুর্ঘটনায় পুড়ে যায়। তার ফলে সেদিকটা ঢেকে রাখেন সবসময়।

—তা হলে মিসেস সেনের মুখটাও ঢাকা ছিল ?

—হ্যাঁ।

—একপাশের চুল নিশ্চয় দেখা যাচ্ছিল ?

—অতটা লক্ষ্য করিনি।

কর্ণেল একটু চুপ করে থেকে বললেন—পার্থবাবুর সঙ্গে তোমার বিয়ের রেজিস্ট্রেশান তো পনরই এপ্রিল হচ্ছে ?

শ্যামলী মুখ নামিয়ে ঈষৎ রাঙা হয়ে জবাব দিল—হ্যাঁ।

কর্ণেল বললেন—জয়ন্ত, তুমি উদীয়মান ফিল্ম হিরো পার্থকুমারের নাম নিশ্চয় শুনেছ ?

—অবশ্যই ! খুব ভাল অভিনয় করেছেন ভদ্রলোক।

— শ্যামলী ! তোমাদের বিয়ের তারিখটা কবে ধার্য করা হয়েছিল ?

—গত ফেব্রুয়ারী মাসে। বাইশ তারিখে। ফিরপোতে পার্টি হয়েছিল ছোটখাটো। মিঃ সেনও উপস্থিত ছিলেন তাতে। এ্যাটর্নী সুশান্ত মজুমদারও ছিলেন।

—মিঃ সেন নিশ্চয় খুসি হয়েছিলেন ? তিনি তো বরাবর তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী।

—হ্যাঁ !

—শ্যামলী, আমরা উঠি তাহলে। সময়মতো দেখা হবে। কেমন ?

আমরা উঠে পড়লুম। বাইরে লিফট অব্দি এগিয়ে দিতে এল শ্যামলী। কর্ণেল লিফটে পা রেখে ফের বললেন—ইয়ে, সাবধানে

থেকে। না না! তোমাকে কেউ খুনজখম করতে পারে, বলছি না। তাতে কারো লাভ হবে না। তোমার অংশের সম্পত্তি সটান চলে যাবে সরকারের হাতে। কারণ তোমার কোন সন্তানাদি এখন নেই।

শ্যামলী মৃদু হাসল। আমরা খাঁচার মধ্যে তলিয়ে যেতে থাকলুম।

নিচে নেমে গাড়িতে উঠে বসলাম। কর্ণেল বললেন, কী মনে হচ্ছে জয়ন্ত?

গিয়ারে হাত রেখে জবাব দিলুম—কাল রাত থেকে এত কাণ্ডে জড়িয়ে রয়েছেন আমাকে বলেননি তো!

—শ্যামলী যত চালাক, তত বোকা।...বলে কর্ণেল চুরুট ধরালেন। ফের বললেন—হুম, কী যেন বলছিলে জয়ন্ত? তোমাকে কিছু জানাইনি। তাই না? আগে সব জানালে তোমার রিঅ্যাকশানটা অন্যরকম হত। তার ফলে আমার একটা জিনিস জানা হত না। ঘটনার চেহারাটা দেখে কারো মনে আপনাআপনি সন্দেহ হয় কি না —জানবার উদ্দেশ্য ছিল আমার। দেখলুম, কোন সন্দেহ হয় না—

—অন্তত তোমার হল না। অথচ তুমি নিতান্ত নোভিস বা লেম্যান নও—একজন ঝানু দে রিপোর্টার। কাজেই আমি সিদ্ধান্তে এলুম যে এই দুর্ঘটনার পিছনে ক্ষুরধার মস্তিষ্ক রয়েছে।

—কিন্তু শ্যামলীর সম্পত্তি পাওয়ার তথ্য জেনে আমি সন্দেহ প্রকাশ করেছিলুম।

—সে তো নিছক সন্দেহ। প্রেজুডিসড হয়ে পড়া—তোমার ভাষায়। কিন্তু আমি আঙুল দিয়ে না দেখালে দুর্ঘটনার বিবরণে কি তোমার কাছে কোন অসঙ্গতি ধরা পড়েছিল? অস্বীকার করো না ডার্লিং!

—ঠিক বলেছেন। কিন্তু আমরা এখন কোথায় যাব? এবারও কি অবচেতন মনের নির্দেশে গাড়ি চলবে?

—নো, নো! কর্ণেল হেসে উঠলেন।—তাহলে তুমি সোজা এখন বিলাসপুরে নিয়ে তুলবে। আমি তো জানি। তাই এবার বলে

দিই—আমরা যাব নিউ আলিপুরে। মিসেস সেনের কাছে।....

তিন

॥ শ্যামলীর প্রবেশ ও প্রস্থান ॥

মিসেস সেনের বয়স অনুমান করার প্রথম বাধা হল ওঁর ঘোমটায় ঢাকা আদ্ধেক মুখ। বাকি আদ্ধেকও ঢাকা পড়েছে বলা যায়: শরীরে প্রচুর মেদ থাকলেও বেশ শক্ত সমর্থ মনে হচ্ছিল। আমি আন্দাজে বয়সটা বিয়াল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে কোথাও দাঁড় করাতে পারি।

ভদ্রমহিলার কণ্ঠস্বরটা অদ্ভুত লাগল। চাপা, একটু ভাঙা' সেইসঙ্গে ফিসফিসানির মতো কতকটা— ইংরাজীতে যাকে বলে হিসিং সাউণ্ড। টনসিলের দোষ থাকলে এমন হতে পারে শুনেছি।

আমাদের ড্রইংরুমে ঢোকার আধ মিনিটের মধ্যে উনি এসে গিয়েছিলেন। আমার পরিচয় কর্ণেল যথারীতি দিলেন। তারপর ওঁদের কথা শুরু হল। কর্ণেল বললে—বলুন ম্যাডাম, অধমকে কী জন্যে স্মরণ করেছেন?

মিসেস স্বাগতা সেন বললেন, আমার এক দূর সম্পর্কের আত্মীয় মৃগেন দাশগুপ্ত—রিটায়ার্ড মুন্সেফ উনি, বলেছিলেন যে উইলটা নিশ্চয় জাল। কিন্তু প্রমাণ করতে হলে অনেক ব্যাকগ্রাউণ্ড ইনফরমেশান দরকার হবে। সেগুলো যোগাড় করে দিলেই উনি কেস লড়বার ব্যবস্থা করতে পারবেন। তাছাড়া আমাদের ফ্যামিলি ফিজিশিয়ানও বলেছেন।

কর্ণেল টাক চুলকে বললেন—রাইট, রাইট।

—হুনেনদাই আপনার কথা বলেছেন। আপনি তো একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটার—মানে, গোয়েন্দা হিসাবে আপনার কথা আমিও নিউজপেপারে পড়েছি। আপনি যদি আমাকে সাহায্য করেন, তা হলে · ···

কর্নেল আবার বললেন—রাইট, রাইট।

স্বাগতা সেন সোৎসাহে ঝুঁকে পড়লেন ওঁর দিকে। বললেন—আপনার ফি কত জানিনা—যদি কিছু না মনে করেন, আড়াই হাজার টাকা আপনাকে রেমুনারেশান দেব!

কর্নেল আশ্চর্য, অতীব বিস্ময়কর, সহাস্যে বললেন—অগ্রিম কত দেবেন শুনি?

—আপাতত দু'হাজার দিন। কেস জিতলে বাকিটা অবশ্য দেব।

আমাকে হতভম্ব করে কর্নেল দরকষাকষি শুরু করলেন। অগ্রিম অন্তত দু'হাজার চাই। কেস জিতুন বা হারুন, বাকি পাঁচশো পুরো তথ্য দাখিল করলে দিতে হবে। অনেকটা সময় এই বিচিত্র এবং অকল্পনীয় দরদস্তুর চলল। আমি ঘেমে সারা। এ কী কাণ্ড করছেন কর্নেল! জীবনে কখনও কোন কেসে একটি পয়সা কারো কাছে চাননি—দাবি করেননি, নিজের পকেট থেকে একগাদা টাকা খরচ করে গেছেন হাসিমুখে, তিনি এই কেসে টাকার অঙ্ক এবং সর্ত নিয়ে তুমুল লড়ে যাচ্ছেন!

অবশেষে রফা হল। স্বাগতা সেন কর্নেলের সর্তই মেনে নিলেন। বুকের ভিতর থেকে যাদুকরের মতো একটা ছোট্ট পার্স বের করলেন। তার মধ্যে ভাঁজকরা চেকবই আর কলম ছিল। তক্ষুনি একটা চেক লিখে দিলেন। কর্নেল সেটা পকেটস্থ করে চুরুট ধরালেন। তারপর বললেন—হুম! তাহলে এবার আমাকে কিছু সঠিক তথ্য দিতে হবে ম্যাডাম।

মিসেস সেন হিসহিস করে উঠলেন—বা রে! তথ্য যদি আমিই

দিতে পারব, তাহলে আপনাকে টাকা দিলাম কেন? ও আপনি কী বলেছেন?

—দেখুন মিসেস সেন, অন্ধকারে আমি এগোতে চাই না। আমি শুধু আপনাকে প্রশ্ন করে যাবো, আপনি জবাব দেবেন—যে জবাব আপনার জানা। যা জানা নয়, বলবেন—জানিনে, ব্যাস। চুকে গেল।

মিসেস সেন একটু চুপ করে থাকার পর বললেন, ঠিক আছে। বলুন কী জানতে চান?

—বিলাসপুরের বাগানবাড়িতে পিকনিক করার প্রথা আপনাদের নতুন নয়—প্রতি বছর চৈত্রের দোল পূর্ণিমায় আপনারা সেখানে একটা দিন ও রাত কাটিয়ে আসেন। পার্টি হয়। অনেকটা রাত অব্দি নাচগান ধুমধামও হয়। কেমন?

—হ্যাঁ।

—এবার অর্থাৎ গত বছর মার্চ মাসে আপনারা সেই দোলেই গেলেন। এবারও কি পার্টি দিয়েছিলেন?

—না। আমরা পিকনিকটা নিজেদের কয়েকজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছিলাম।

—কেন?

—মিঃ সেন ইদানীং হইহল্লা বরদাস্ত করতে পারতেন না। একা থাকতে ভালবাসতেন। বয়স হচ্ছিল—শরীরও ভালো যাচ্ছিল না। আমি ওঁকে ফিল করতে পেরেছি বরাবর। আমরা নিঃসন্তান দম্পতি—বুঝতেই পারছেন। তাই ঠিক হল, এবার মোটেও পার্টি দেওয়া হবে না।

—রাইট! তো কে কে গেলেন ওখানে?

—আমরা স্বামী-স্ত্রী, আমার বোনের ছেলে ডাক্তার অমরেশ গুপ্ত, ওঁর বন্ধু এ্যাটর্নি সুশান্ত মজুমদার, এই ক'জন মাত্র। বাকি একজন আমাদের রাঁধুনি ঘনশ্যাম, দুজন চাকর জগন্নাথ আর সোফার সুরেন্দ্র। সুশান্তবাবু নিজের গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এসেছিলেন।

আমার পৌঁছনোর অনেকটা পরে উনি পৌঁছান।

—এবার খুব ভাল করে স্মরণ করুন মিসেস সেন, ঘটনাটা কীভাবে ঘটল।

মিসেস সেন এতক্ষণে ফোঁস করে উঠলেন।—কী বিপদ! আপনি ওঁর এ্যাকসিডেন্ট নিয়ে এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? আপনি উইল সম্পর্কে কোন কথাও তো জিগ্যেস করছেন না! এ্যাকসিডেন্ট ইজ এ্যাকসিডেন্ট! আর ওই ভয়ঙ্কর স্মৃতি ঘেঁটে কি আমার স্বামীকে ফিরে পাব?

মিসেস সেন ঠিক যে সুরে 'এ্যাকসিডেন্ট ইজ এ্যাকসিডেন্ট' বললেন—লক্ষ্য করলাম—অবিকল একই সুরে বলছিল শ্যামলী। 'উইল ইজ উইল'

কর্ণেল মুখ গোমড়া করে বললেন—ম্যাডাম, আমার কাজে যথেষ্ট স্বাধীনতা না দিলে আমি এক্ষুনি চেক ফেরত দেব এবং চলে যাব। কোন তথ্য আপনার স্বার্থে যাবে, ডিয়ার ম্যাডাম, তা যদি আপনি টের পেতেন—তাহলে এই নীলাদ্রি সরকারকে কারো দরকার হত না।

—আপনি বলছেন, এ্যাকসিডেন্টের সঙ্গে উইলের সম্পর্ক আছে?

—কে বলতে পারে নেই বা আছে? যদি থাকে?

—কী জানি, আমি ওসব বুঝি না। আপনি যা জিগ্যেস করার করুন।

—যখন রাইফেল হাতে মিঃ সেন দৌড়ে যান···

—উঁহু। গোড়া থেকে শুনুন। তখন সবে সাড়ে পাঁচটার কাছাকাছি হবে—সূর্য গাছপালার আড়ালে গেছে। কিন্তু যথেষ্ট আলো আছে। আমি, অমরেশ আর সুশান্তবাবু তাঁবুর সামনে ঘাসের উপর চেয়ার পেতে গল্প করছি। ঘনশ্যাম কাছেই বটগাছটার নিচে ইট জড়ো করে উনুন জ্বেলেছে সবে। জগন্নাথ আর হরিয়া মশলা বাঁটা ইত্যাদিতে ব্যস্ত। সুরেন্দ্র দাঁড়িয়ে তদারক করছিল। তারপর দেখলাম, সুশান্তবাবু ঢিল ছুঁড়ে কাক তাড়াতে লাগলেন।

তখন সবাই তাকিয়ে দেখি বটগাছটায় রাজ্যের কাক এসে বসে রয়েছে—প্রচণ্ড চেঁচামেচি করছে। আমরাও দেখাদেখি ওর সঙ্গে কাক তাড়াতে লাগলাম হইচই করে। কাকগুলোর নড়ার নাম নেই তবু।

—তখন মিঃ সেন কোথায় ছিলেন?

—ঘরে কোথাও ছিলেন।

—ঘরে মানে?

—কি বিপদ! ওখানে আমাদের—মানে ওঁর পৈতৃক বাড়ি রয়েছে যে। কুঠিবাড়ি বলে সবাই। নীলকুঠি না রেশমকুঠির কোন বৃটিশ অফিসার থাকত। পরে আমার শ্বশুর নাকি কিনেছিলেন। একশ বছরের বেশী বয়স বাড়িটার। একতালা। আটদশটা ঘর রয়েছে। আমরা মোটামুটি সাজিয়ে রেখেছি বরাবর। তা—

—আপনারা যেখানটা তাঁবু করেছিলেন, তার কতদূরে বাড়িটা?

—আমি মেপে দেখিনি। অনেকটা দূরে। ইচ্ছে হলে গিয়ে দেখে আসবেন।

—তারপর কি হল বলুন?

—আশেপাশে ভাঙা পাঁচিলের অজস্র ইট পড়েছিল। আমরা তা গুঁড়ো করে ছুঁড়তে শুরু করলাম। একসঙ্গে অতসব তাড়া খেয়ে কাকগুলো পালাতে লাগল। কুঠিবাড়ির কাছাকাছি যেতেই দেখি উনি বন্দুক হাতে নিয়ে দৌড়চ্ছেন।

—কোন্‌দিকে?

—কাকগুলো যেদিকে যাচ্ছিল, সেইদিকে।

—তারপর?

—ব্যাপার দেখে আমরা হাসাহাসি করলাম।

—আপনারা কেউ গেলেন না?

—কী হবে গিয়ে? আমরা আবার গল্পগুজবে মেতে গেলাম। ...বলে স্বাগতা সেন আবার চটে গেলেন।—ওই দেখুন, সেই এ্যাকসিডেন্ট আর এ্যাকসিডেন্ট! মিঃ সরকার, আমি যা বলার

পুলিশকে সব বলেছি। ইচ্ছে হলে ওদের কাছে গিয়ে জেনে নিন প্লিজ, সেই ভয়ঙ্কর ঘটনার কাছে আমাকে আর নিয়ে যাবেন না।

—প্লিজ মিসেস সেন, এটা ভাইটাল। শুধু বলুন—ঠিক কটায় মিঃ সেনকে খুঁজতে পাঠান আপনারা?

—সাড়ে সাতটায়।

—তাহলে সাড়ে পাঁচটা থেকে সাড়ে সাতটা অব্দি আপনি, ডাক্তার অমরেশ গুপ্ত, মিঃ মজুমদার, রাঁধুনী, দুজন চাকর এবং সোফার এইখানেই ছিলেন? নাকি কেউ ইতিমধ্যে কোথাও গিয়েছিল?

মিসেস সেন হিসহিস করে উঠলেন—কী বলতে চান আপনি?

—আমি ঘটনাটার একটা স্পষ্ট ছবি চাই।

—কেউ আমরা নড়িনি এখান থেকে।

—আপনার তাহলে নিশ্চয় কড়া নজর ছিল প্রত্যেকের দিকে?

—তার মানে?

—তা না হলে কেমন করে জানলেন যে কেউ কথাও গিয়েছিল কি না?

থেমে গেলেন স্বাগতা সেন। তিনি একমুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন—আপনি হয়তো ঠিকই বলেছেন। আমি অত লক্ষ্য রাখিনি। কিন্তু যদি কেউ এখান থেকে সরে গিয়ে আবার এসে থাকে, সে তো আমাদের রাঁধুনী চাকর দুজন আর সোফারের মধ্যে কেউ। অমরেশ বা মিঃ মজুমদার আমার কাছেই ছিলেন। জগন্নাথদের জিজ্ঞেস করলেই হবে। কিন্তু ওরা—ওরা কেন··· মিঃ সরকার, আবার আপনি সাংঘাতিক কিছু হাতে নিয়েছেন! আপনি কি বলতে চান কেউ ওঁকে খুন করেছে?

—আমি কিছুই বলতে চাইনে স্বাগতা দেবী। আমি সত্যে পৌঁছতে চাই।

মিসেস সেন এবার ছটফট করে উঠলেন। ঘোমটাটি ভালো করে তারপর দেং

ঢেকে কুৎসিত ভঙ্গীতে কেঁদে উঠলেন! প্রথমে কিছুক্ষণ কিছু বোঝা গেল না কী বলছেন। অবশেষে বোঝা গেল।—এ আমি ভাবিনি! সত্যি, ভাবিনি! আপনি ঠিকই বলেছেন। ওই হারামজাদী বেশ্যা মেয়েটা ওঁকে ভুলিয়ে সর্বনাশ করবে আমি জানতাম! ঠিক—ঠিক। ওঁকে গুণ্ডা লাগিয়ে খুন করেছে। আমরা ভুল বুঝেছিলাম! পুলিশ—পুলিশকেও টাকা খাইয়ে ও মিথ্যা রিপোর্ট লিখিয়েছে!

কর্ণেল ওঁকে সান্ত্বনা দিতে ব্যস্ত হলেন। আমার মাথা ধরে উঠেছিল। কর্ণেলকে ইসারায় বললাম—বাইরে একটু ঘোরাঘুরি করছি। কর্ণেল আমার দিকে মনোযোগ দিলেন না। আমি বেরিয়ে এলাম। এটা দোতালা। সিঁড়ি বেয়ে নিচে গেলাম। কাকেও দেখলাম না। বাথরুমে যাওয়ার দরকার হল সেইসময়। ভাবলাম কাজটা সেরে নিই। এদিক ওদিক খুঁজেও টয়লেটের পাত্তা পেলাম না। কোন লোক নেই যে জিগ্যেস করব। ডাইনের ঘরে ভারি পর্দা ঝুলছে। ভিতরে কথা বলার আওয়াজ পেলাম। মরীয়া হয়ে ওখানেই কাকেও জিগ্যেস করব ভেবে পর্দা একটু ফাঁক করলাম। তারপরই অবাক হয়ে পেছিয়ে এলাম। মিস শ্যামলী বসে রয়েছে!

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছি—সেই সময় একজন খাকি হাফপ্যান্ট শার্টপরা বুড়ো সারভ্যান্ট গোছের লোক সিঁড়ি বেয়ে নামছে দেখলাম। তাকে জিগ্যেস করতেই বলল—এগিয়ে যান—বাঁদিকে পড়বে।

টয়লেটে কাজ সেরে আরামে পাইপ ধরিয়ে আসছি, সেই দরজার কাছে এসে শ্যামলী আর কার চাপা কথাবার্তার আওয়াজটা আবার কানে এল। কৌতূহলও বটে, আবার শ্যামলীকে চমকে দেবার ছেলেমানুষী তাগিদেও বটে—কর্ণেলের তোয়াক্কা না করে পর্দাটা ফাঁক করলাম। দেখলাম, শ্যামলীর মুখোমুখি বসে রয়েছেন মিসেস সেন। সেই হিসহিসে ভাঙা কণ্ঠস্বর!

কখন নেমে এসেছেন ভদ্রমহিলা—আমি টয়লেটে ঢোকার পরে। তাহলে কর্ণেল বেরিয়ে গেছেন! আমি বেরিয়ে লনে গেলাম।

কিন্তু কর্ণেলকে খুঁজে পেলাম না। কোথায় গেলেন বৃদ্ধ গোয়েন্দাপ্রবর? আমার গাড়িতে হেলান দিয়ে সিগ্রেট ধরালাম। দাঁড়িয়ে থেকে থেকে পা ধরে গেল। এগারোটা বাজল। কর্ণেল বেরোচ্ছেন না। বাড়ির কোন লোকও দেখছি না যে জিগ্যেস করব। তখন ফের ঢুকলাম গিয়ে। প্রথমে সেই ঘরের পর্দাটা তুললাম, মিস শ্যামলী নেই—মিসেস সেনও নেই! তাহলে সবাই ওপরে গেছেন! যাক্ গে, ইউলের একটা ফয়সালা হয়ে যাক।

ওপরে গেলাম। সেই ড্রইংরুমে কর্ণেল নেই। কোথায় গেলেন তাহলে? হয়তো অন্য কোন ঘরে—গোপনে বোঝাপড়া হচ্ছে। টানা বারান্দা দিয়ে এগোলাম সেইসময় ফের সেই খাকি পোষাকপরা লোকটাকে দেখা গেল। বললাম—বুড়ো ভদ্রলোক—মানে যিনি মিসেস সেনের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তিনি কোথায়?

ও বলল—এই তো একটু আগে নিচে গেলেন। চলুন, আমি দেখছি।

সে পা বাড়াল। বললাম—তোমার নাম কী?

—আজ্ঞে, জগন্নাথ স্যার।

— হরিয়া নামে আরেকজন আছে, সে কথায়?

—দেশে গেছে স্যার। গত কালকে। মেদিনীপুর ওর বাড়ি। সেখানে গেছে। পরশু আসবে।

—জগন্নাথ, তুমি তো এ্যাকসিডেন্টের দিন বিলাসপুরে ছিলে!

সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে গেল সে। সন্দিগ্ধ স্বরে প্রশ্ন করল—আপনি কি স্যার পুলিশ?

—আরে, না না! আমি এমনি জিগ্যেস করছি। আমি খবরের কাগজের লোক।

—ছিলাম স্যার। আরো সবাই ছিল—হরিয়া, এটর্নিবাবু··· ডাক্তারবাবু তো এখনও আছেন। ওনাকেও জিগ্যেস করুন। সব বলবেন।

—আচ্ছা জগন্নাথ, সেদিন পিকনিকে নিশ্চয় খুব ধূমধাম হয়েছিল?

—আগেরবারের মতো কিছুই নয়।

—তবে ফুলটুল দিয়ে নিশ্চয় ইয়ে সাজিয়েছিলে তোমরা?

জগন্নাথ ফ্যাঁচ করে হাসল।—কি সাজাব স্যার? ও তো বনভোজন! বনজঙ্গুলে জায়গা। ফুল এমনিতেই কত ফুটেছিল চার্দ্দিকে। হ্যাঁ—একসময় মালী ছিল, তখন কেতা ছিল। এখন আর যত্ন হয় না। সব জঙ্গল হয়ে গেছে।

—তাহলেও তো আমাদ-প্রমোদের জন্যে যাওয়া! নিশ্চয় তোমরা সবাই জামায় টামায় দু'একটা ফুলটুল গুঁজে ছিলে? এ্যাঁ?

আমার কৌতুকী ভঙ্গীতে ও হেসে গড়িয়ে পড়ল প্রায়। বলল—আমরা কাক তাড়াব, না মশলা বাঁটব—না ফুল···কী যে বলেন স্যার! আমরা চাকারবাকর লোক। আমাদের ও সখ থাকতে নেই।

—তোমাদের সায়েবরা নিশ্চয় ফুল গুঁ—···

জগন্নাথ পা বাড়িয়ে বলল, নাঃ—ফুল টুল···না তো!

—তোমাদের গিন্নিমা নিশ্চয় গুঁ—···

জগন্নাথ ভাঙা দাঁত খুলে হেসে খুন। তারপর চাপা গলায় এবং নিজের মাথা দেখিয়ে বলল—গুঁজবেন কোথা? মুখ যে পোড়া হনুমান! সে জানেন না বুঝি? আর বলবেন না—যদ্দিন থেকে জুটেছেন, হাড়মাস কালি হয়ে গেল! হরিয়া কি সাধে এ্যাদ্দিন পালিয়েছে? আপনাকে বলার মতো মনে হল—তাই দুঃখের কথা বলছি স্যার। খবরের কাগজে তো আপনারা চাকরদের চোর ডাকাত খুনে বলে নিন্দে করেন, কিন্তু মনিবের সাইডটা তো ছ্যাখেন না!

—কেউ বললে তো লিখব সেকথা! এই তুমি বলছ এবার লিখব।

—লিখবেন স্যার, তবে যদি সরকারের চোখে পড়ে! বুঝলেন স্যার হরিয়া আর আসবে না। আমিও কেটে পড়ছি শিগগির।

—কেন, কেন জগন্নাথ ?

—বলছি তো। নতুন গিন্নিমা এসে ··

—নতুন গিন্নিমা মানে ?

—হ্যাঁ স্যার। এই তো কমাস হল সায়েব বিয়ে করে বসলেন আবার। বোম্বে গেলেন—ফিরে এলেন একেবারে বউ নিয়ে। বউ না কালসাপ ! এসেই খেল ওনাকে !

আমি অবাক হয়ে গেলাম। বললাম—সায়েবের আগের স্ত্রী মারা গিয়েছিলেন নাকি ?

—হ্যাঁ। সে তো কবে—আট ন'বছর আগে। অমন মানুষ আর জন্মায় না স্যার। আর এনার কথা বলবেন ? দজ্জাল, খটরাগী ! সবচেয়ে অবাক লাগে স্যার, সায়েব আর মেয়ে পাননি—ওই মুখপড়া রাক্ষুসীকে ঘরে নিয়ে এলেন !

—বল কী জগন্নাথ ! মুখপড়া অবস্থায় ঘরে নিয়ে এলেন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। নতুন বৌদি এসে অব্দি দেখি ঘোমটা খোলেন না ! পরে শুনি কী এ্যাকসিডেন্ট হয়ে মুখটা গেছে। পেলাস্টিক করিয়েছিলেন---

—প্লাস্টিক সার্জারি ?

—তাই হবে। কিন্তু তাতেও নাকি কাজ হয়নি।

আমরা সিঁড়ি থেকে নেমে ইতিমধ্যে লাউঞ্জে এসে কথা বলছি। সেইসময় ফুটফুটে সাদা সায়েবচেহারার এক ভদ্রলোককে ওদিকের একটা ঘর থেকে আরেকটা ঘরে ঢুকতে দেখলাম। জগন্নাথ চোখ নাচিয়ে বলল—উনিই গিন্নিমার ভাই—সেইডাক্তারবাবু। পিকনিকের আগের দিন এসেছেন। থাকেন বোম্বেতে।

হঠাৎ লাফিয়ে উঠল জগন্নাথ। —ওই যাঃ! আমার দেরী হয়ে গেল। আপনি ঐ ঘরে চলে যান স্যার, লাইব্রেরীঘরে। বুড়ো সায়েব ওখানেই ঢুকেছেন।

জগন্নাথ চলে গেল। ও যে ঘরটা দেখাল, সেই ঘরেই আমি শ্যামলীকে মিসেস সেনের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছি।

সটান ঢুকে দেখি, কর্ণেল আর মিসেস সেন কোণে একসার আলমারির কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমাকে দেখে কর্ণেল ইসারায় কাছে যেতে বললেন।

অজস্র ছোটবড় আলমারি আর বুকসেলফে ভরতি ঘরটা। কোণের দিকে সোফাসেট একটা। কাছে গিয়ে আমার শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল। অস্ফুট চিৎকার করে উঠলাম—শ্যামলীর কী হয়েছে কর্ণেল?

শ্যামলী মেঝেয় পড়ে রয়েছে নিথর একেবারে। চোখদুটো ফেটে বেরিয়ে পড়েছে। জিভটাও বেরিয়ে গেছে। কী বীভৎস দেখাচ্ছে ওকে! সেই সুন্দর শরীর থেকে একটা ভয়ঙ্কর বিকৃত সত্তা আত্মপ্রকাশ করেছে।

কর্ণেল বললেন, শী ইজ ডেড। একটু আগে কেউ ওকে গলা টিপে খুন করেছে, জয়ন্ত। কিন্তু বুঝতে পারছিনে—কেন এখানে এল ও?

আমি মিসেস সেনের দিকে আঙুল তুলে বলতে যাচ্ছিলাম যে ওঁকেই একটু আগে এখানে শ্যামলীর সঙ্গে কথা বলতে দেখেছি—কিন্তু কর্ণেল যেন চকিতে টের পেয়ে বলে উঠলেন—আমি আর মিসেস সেন বরাবর একসঙ্গে ছিলাম, জয়ন্ত। দুজনে একইসঙ্গে এঘরে ঢুকে শ্যামলীর ডেডবডিটা দেখতে পেয়েছি।

মিসেস সেন কাঁপছিলেন। হিসহিস কণ্ঠস্বরে বললেন—কেউ পুলিসে ফোন করছেন না কেন আপনারা? আমি যে বিপদে পড়ে গেলাম! আমারই ঘরে ওঃ! দু'হাতের তেলোয় মুখ নামালেন উনি। পিঠটা ফুলে ফুলে কাঁপতে থাকল।

কর্ণেল বললেন—জয়ন্ত, লালবাজারে আরেক জয়ন্ত রয়েছে। প্রথমে ওকে ডাকো। ওই ছাখো, ফোন রয়েছে। শুধু বলো এখানে কর্ণেল সরকার এক্ষুণি আসতে বলেছেন।

—যদি উনি না থাকেন?

—ময়ুখ ব্যানার্জিকে ডেকে দিতে বলবে

আমি ফোনের কাছে গেলাম। ফোন করতে করতে লক্ষ্য করলাম, কাছে যে বিশাল পর্দাটা ঝুলছে, তার ওধারে কেউ দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার পা দুটো দেখা গেল। পুরুষই। পায়ে হালকা চটি রয়েছে। পাজামা পরা লোক।

জয়ন্তবাবুকেই পাওয়া গেল। ফোন করেই পর্দা তুললাম। ডাক্তার অমরেশ গুপ্ত হকচকিয়ে গেলেন। বললাম—এখানে কী করছেন আপনি?

ভদ্রলোক কাঁচুমাচু মুখে জবাব দিলেন—কী ব্যাপার ঘটেছে লাইব্রেরীর ভেতরে, আঁচ করছিলাম। কিন্তু সাহস হচ্ছিল না—পাছে আবার ডেডবডি দেখতে হয়।

—আপনি তো ডাক্তার। ডেডবডিতে ভয় হবার কথা নয়।

কর্ণেল ডাকছিলেন।—কার সঙ্গে কথা বলছ জয়ন্ত?

আমি অমরেশের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলাম। ভদ্রলোক গুটিসুটি দিব্যি চলে এলেন—বাধা দিলেন না। তারপর আঁতকে উঠে বললেন—কী সর্বনাশ!

মিসেস সেন স্প্রিঙের মতো ঘুরে ভাইয়ের বুকে ভেঙে পড়লেন। সে দৃশ্য দেখবার মতো। কর্ণেল ঘড়ি দেখছেন আর টাক চুলকোচ্ছেন। আমি থ।···

চার

॥ চুল এবং ফুল ॥

সেদিন পুরোটা কী হল, সে বর্ণনা আমি দেব না। পুলিশের এসব ক্ষেত্রে যে রুটিন ওয়ার্কস অর্থাৎ ছকবাঁধা কাজকর্ম থাকে, তা যেমন ক্লান্তিকর আর বৈচিত্র্যহীন, তার বর্ণনাও তেমনি বিরক্তিকর হবে। হত্যাকারীর হাতে দস্তানা ছিল নিশ্চয়। কোথাও আঙুলের ছাপ পাওয়া যায়নি। কোন সূত্র না—কোন নতুন তথ্যও না। অবশেষে পুলিশ যথারীতি শ্যামলীকে খুনের সন্দেহে মিসেস সেন আর অমরেশকে গ্রেপ্তার করেছিল।

আমি একটা মারাত্মক সাক্ষী হতে পারতাম—কারণ শ্যামলীর সঙ্গে মিসেস সেনকে কথা বলতে দেখেছি ওই জায়গাতেই, তখন কর্ণেল ওখানে উপস্থিত ছিলেন না।

অথচ কর্ণেল বলছেন—তিনি আর মিসেস সেন আগাগোড়া এক সঙ্গে আছেন। কথা বলছেন। তারপর একসঙ্গে নিচে নেমে এসেছেন। লাইব্রেরী ঢুকেছেন মিঃ সেনের কিছু কাগজপত্র পরীক্ষা করতে।

তাহলে—হয় আমি ভুল দেখেছি, নয় কর্ণেল মিথ্যা বলছেন! অথচ দুজনেই জোরের সঙ্গে নিজের নিজের বর্ণনা দিচ্ছে। অগত্যা পুলিশ দুজনেরই সাক্ষ্য থেকে ও প্রসঙ্গটা আপাতত বাদ রেখেছে। মাঝখান থেকে আমি রেগেমেগে কর্ণেলের বার্ধক্যজনিত মতিভ্রম ও বুদ্ধিভ্রংশের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে শেষে মন খারাপ করে বসলাম। এমন কি একা গাড়ী নিয়ে চলে এলাম। কর্ণেলের মুখটা গম্ভীর দেখেছিলাম। একটি কুথাও

বিতর্কের ছলে বলেননি। পুলিশের গাড়িতে উনি বাসায় ফিরলেন।

রাতে আর ঘুম হল না। কর্নেলের কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে আসব ঠিক করলাম। রাত তখন প্রায় বারটা, হঠাৎ ফোন বাজল। একবার ভাবলাম, থাকগে, নির্ঘাৎ আমার কাগজের অফিস ডাকছে। আমার স্ত্রী চন্দ্রানীও ঘুমোয়নি। সে সব শুনে খালি হাসছে আর বলছে—এবার নাককান মলে প্রতিজ্ঞা করো, আর কখনো গোয়েন্দাগিরি করতে যাবে না। স্রেফ খবর রিপোর্টিং নিয়েই থাকো। তুমি আজকাল দিনদুপুরে কাসব হ্যালুসিনেসান দেখতে আরম্ভ করলে অ.শেষে! এরপর খামাকা যাকেতাকে ধরে বলে ফেলবে—এই তো, দেখলুম খুন করছিল! স্বচক্ষে দেখলুম! আর দ্যাখো, তোমার এবার চশমা নেওয়া দরকার! শিগগির!

চন্দ্রানী ভীষণ বলতে পারে। আমি কান করিনি। এখন দেখলাম, সে চোখ খুলে ঠোঁটে হাসি রেখে ফোন তুলল—হ্যালো! কাকে চান?

তারপর আমারদিকে ফোনাটা এগিয়ে বলল—ইওর ওল্ড গাই।

—কে?

—আমার হাত ধরে যাচ্ছে। নেবে তো নাও।

কানে রাখতেই কর্নেলের সস্নেহ কণ্ঠস্বর শুনলাম—ডার্লিং জয়ন্ত, আশা করি তোমার ঘুম হচ্ছে না। শোন, তাই বলে ওষুধ খেয়ে বসো না। ড্রাগ হ্যাবিট মানুষের সর্বনাশ করে। দেখছ তো, আমি কেন ওষুধ না খেয়েই চালিয়ে দিচ্ছি! ঘুম না এলে ভালো করে ঘাড় আর হাতের কনুই অব্দি ধুয়ে ফেলো। আর ইয়ে শোন ডার্লিং, ইউ আর রাইট। তুমি লাইব্রেরী রুমে খুনীকেই দেখেছিলে। কিন্তু সে মিসেস সেনের ছদ্মবেশে বসেছিল। মুখটা কালো শাড়ির আঁচলে ঘোমটা দিয়ে ঢাকা—অবিকল যেমন মিসেস সেন ঢেকে

রাখেন। ব্যাপারটা এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত শ্যামলীর ফ্ল্যাটে যে ঝি মেয়েটি থাকে—সে বলেছে, একটা ফোন এসেছিল বাইরে থেকে। ফোন পেয়েই চলে যায় শ্যামলী। ওকে বলে যায়—মিঃ সেনের নিউআলিপুরের বাড়ি থেকে কর্ণেল সরকার ওকে এক্ষুনি যেতে বলেছেন। বুদ্ধিমতী মেয়ে—বুদ্ধি করে বলেও গিয়েছিল। কিন্তু জয়ন্ত, আগে বলেছিলুম তোমাকে—ও বোকাও তত।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। বললাম,—কর্ণেল, কর্ণেল! আপনি ঠিক বলেছেন। আমি তাহলে ছদ্মবেশী খুনীকেই দেখেছিলাম। ইস্! যদি আর একটু বুদ্ধি করে ওখানটায়—

—যা হবার হয়ে গেছে। তবে আমি এদিকটা এত গুরুত্ব দিয়ে ভাবিনি! শ্যামলীকে কেউ সত্যি মেরে ফেলবে—আঁচ করতে পারিনি। কারণ নিছক প্রতিহিংসা ছাড়া ওকে মেরে তো কেউ লাভবান হচ্ছে না। প্রতিহিংসার একমাত্র জায়গা মিসেস সেন। অথচ ওঁর অ্যালিবাই অর্থাৎ অজুহাত ভীষণ শক্ত। কারণ আমি বরাবর সঙ্গে ছিলাম।

—কর্ণেল, আপনি জানেন না, ভদ্রমহিলা আপনাকে একটা প্রচণ্ড মিথ্যা বলেছেন। উনি আগের কোন পিকনিকে বিলাসপুরে মোটেও যান নি। কারণ উনি তখন মিঃ সেনের স্ত্রীই ছিলেন না। মাত্র কমাস আগে বোম্বে থেকে ওঁকে মিঃ সেন বিয়ে করে এনেছেন।... জগন্নাথের কাছে শোনা ঘটনাটা বললাম কর্ণেলকে।

কর্ণেল বললেন—মাই গুডনেস!

—তাছাড়া ওঁর ভাই না কে ওই অমরেশ ডাক্তার এই প্রথম ও বাড়ি আসে পিকনিকের ঠিক আগের দিন।

—ও মাই!

—স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, পুলিশ ভুল করেনি। ওই ভাইটাই কালোশাড়ি পরে খুন করেছে শ্যামলীকে। চেহারাটা বা কণ্ঠস্বর কেমন মেয়েলি নয় ওর?

—মাই। মাই!

—কী হল কর্ণেল?

—কিছু না।

—আরে শুনুন, মিসেস সেন তখন আপনার সামনে যা বলেছিলেন—মানে পিকনিকের ব্যাপারটা—মনে হল, মিঃ সেন কাক তাড়াতে দৌড়ে যাননি। ওটা আকস্মিক যোগাযোগ। আমার ধারণা, তাড়া খেয়ে কাকগুলো যখন পালিয়ে যাচ্ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তেই উনি কোন কারণে—সম্ভবত কাকেও দেখে…

—কী বললে, কী বললে?

—হ্যাঁ। হয়তো এমন কাকেও নদীর ধারের ভাঙ্গা পাঁচিলের দিকে—দেখতে পান কাকগুলো তখনই উড়ে যাচ্ছিল,। তাকে গুলি করে মারতে তাড়া করেছিলেন।

—বলে যাও, ডার্লিং!

—তারপরে তার সঙ্গে ওঁর ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়। এবং সেই লোকটা বন্দুক কেড়ে নিয়ে বুদ্ধি করে ওঁকে গলার নীচে নল রেখে গুলি করে, যাতে আত্মহত্যা বলে চালানো যায়—নয়তো দৈবাৎ গুলি ছুটে যায় কাড়াকাড়ি করতে।

—তোমার উন্নতি হবে জয়ন্ত। গুলিটা এ্যাকসিডেন্টাল হলে বাঁদিকের কণ্ঠ তালু ফুঁড়ে বেরোনোর চান্স ছিল। লেগেছে ডানদিকে। দিস ইজ অড। তাছাড়া জয়ন্ত, বন্দুকের ট্রিগারে যে আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে, তা ওঁর বাঁ আঙুলের। আজ লাল বাজারে ফরেনসিক এক্সপার্টরা ফের রিপোর্ট পাঠিয়েছেন। কাজেই খুনই হয়েছেন মিঃ সেন। কুঁদোতে ডানহাতের আঙুলের ছাপ কেন থাকবে? মিঃ সেন লেফটহ্যাণ্ডেড ছিলেন না। ওঁর দুটো হাত স্বাভাবিকভাবে কাজ করত জানা গেছে। কাজেই খুনী বন্দুকটা তাড়াতাড়ি ওই ভাবে রেখেছিস। সবচেয়ে লক্ষ্য করার বিষয়—বন্দুক ওসব ক্ষেত্রে

হাতে থাকবে কেন? ছিটকে পড়বে পাশে। হাতপায়ের খিঁচুনি হবে মৃত্যুর সময়। তাই না?

—অবশ্যই। কিন্তু ফুলের ব্যাপারে কোন সূত্র পেলেন? আমি জগন্নাথকে জিগ্যেস করেছিলাম। ও বলছিল, কেউ ফুলটুল গোঁজেনি—না চুলে, না বাটন হোলে। কর্ণেল, ফুলটা কিন্তু আমার দেখাই হয়নি! কী ফুল?

—লাল গোলাপ। আজ বিকেলে লালবাজার থেকে একজন নার্সারি বিশেষজ্ঞকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। তিনি পরীক্ষা করে বললেন, এই গোলাপগুলোর নাম প্রিন্স এলবার্ট। এখন, মজার কথা—মিঃ সেনের নিউ আলিপুরের বাড়িতে এই ফুলের গাছ রয়েছে।

—তাই নাকি? কর্ণেল, ফুলের বোঁটায় চুল জড়ানো আছে বলেছিল শ্যামলী।

—এক গোছা চুল। একটু লালচে রঙের। ইঞ্চি চার লম্বা।

—কর্ণেল, কর্ণেল! অমরেশের মাথার চুল লালচে দেখেছি। নির্ঘাৎ—

—এখন সব ফরেনসিক এক্সপার্টদের কাছে গেছে। কাল ওঁদের মতামত জানতে পারব। তুমি সকাল সাতটার মধ্যে চলে এস। আমরা বিলাসপুর যাবো।...

ঘুম এবং নার্ভ বিষয়ে কিছু উপদেশ দেবার পর কর্ণেলের ফোন রাখার শব্দ হল। চন্দ্রানী এতক্ষণ শুনছিল বড়োবড়ো চোখে। স্তব্ধ রাতের ফোন—সে আমার খুব কাছেই রয়েছে। কর্ণেলের কথা কিছু কানে যাওয়াও স্বাভাবিক। এবার বলল, ফুল চুল এসব কী ব্যাপার?

ওকে ঘটনাটা বলতে গেলাম, ও বাধা দিল।—বুঝেছি। নিশ্চই শ্যামলীর ডেডবডির কাছে চুল জড়ানো ফুলটা পড়েছিল?

—উঁহু। বিলাসপুরে মিঃ সেনের ডেডবডির কাছে।

চন্দ্রানী একটু ভেবে বলল, মিঃ সেনের সঙ্গে কোন মেয়ে ধস্তাধস্তি করে রাইফেল কেড়ে নিয়ে গুলি করেছিল বলতে চাও নাকি?

—না, মোটেও তা নয়। অমরেশের মাথায় বড় বড় লালচে চুল রয়েছে। সে মিঃ সেনকে...

—কিন্তু তার মোটিভ কি? কি লাভ হবে মিঃ সেনকে খুন করে?

—সেটা এখনও জানা যাচ্ছে না, পরে জানা যাবে নিশ্চয়।

—তুমি সত্যি হাঁদা হয়ে যাচ্ছো! পুরুষমানুষ চুলে ফুল গুঁজবে কেন?

হাঁ করে তাকালাম। তাই তো! অমরেশ চুলে ফুল গুঁজবে কেন?

চন্দ্রানী ডাকল—। চুলটা যাকে বলে প্ল্যাণ্টেড অর্থাৎ অমরেশ গুপ্তকে ফাঁদে ফেলবার জন্য আসল খুনী তার চুল জোগাড় করে ফুল জড়িয়েছে।

—ওর চুল পেল কোথায়?

—হাঁদা, হাঁদা! চিরুণীতে পাবে!

—তাহলে তো বলতে হয় খুনী মিঃ সেনের নিউ আলিপুরের বাড়িরই কেউ।

—হ্যাঁ। সেটাই তো স্বাভাবিক।

—কিন্তু বাড়িতে আর পুরুষমানুষ বলতে তো জগন্নাথ, হরিয়া রাঁধুনী ঘনশ্যাম আর সোফার সুরেন্দ্র। ওরা কেউ খুন করে কী লাভ পাবে? ওরা তো কেউ উইলে লাভবান হচ্ছে না উইল অনুযায়ী অবশ্য তারা একহাজার করে নগদ টাকা পাবে ওই সামান্য টাকার জন্যে কেউ খুন করে না এসব ক্ষেত্রে জগন্নাথের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। ও বুড়ো মানুষ তত জোর নেই গায়ে। হরিয়াকে অবশ্য দেখিনি—সে দেশে গেছে, আর আসবে না নাকি। মিসেস সেন বড় দজ্জাল

ওরা সবাই ওঁর প্রতি খাপ্পা। সুরেন্দ্রকে আমি এখনও দেখিনি। ঘনশ্যামকেও না।

—ও বাড়ির কোন ঝি বা আয়া কিংবা পরিচারিকা নেই?

—দেখিনি। সম্ভবত নেই।

—ঘুমোও! কিছুই দেখোনি—গেছো গোয়েন্দাগিরি করতে। চন্দ্রানী ঠিকই বলেছে। এদিকটা আমাদের খুঁটিয়ে দেখা উচিৎ ছিল। কাল সকালে গিয়েই কর্ণেলকে বলতে হবে।...

ঘড়িতে এলার্ম দিয়েছিলাম সাড়ে ছটার। ঘুম ভাঙলো তার আওয়াজে—কিন্তু বিছানা ছেড়ে উঠতে সাতটাই বেজে গেল।

কর্ণেলের বাসায় পৌঁছলাম সাড়ে সাতটায়। গিয়ে দেখি, কর্ণেল তৈরী। দক্ষিণের সেই জানালায় ঝুঁকে বাইরে তাকিয়ে রয়েছেন। ঢুকে বললাম—দুঃখিত। দেরী করে ফেললাম।

কর্ণেল মুখ না ঘুরিয়ে বললেন—একটা মজার কাণ্ড দেখে যাও, জয়ন্ত।

কাছে গিয়ে উঁকি দিলাম। নিচে খানিকটা পোড়ো জায়গা রয়েছে। জানলা থেকে বড়জোর চার মিটার তফাতে একটা জামরুল গাছ—তার মাথার শেষ উঁচু পাতাটি এই জানলার নিচের চৌকাঠের সমান্তরালে। বললাম—কী?

—কাকের বাসা। ঐ গ্যাখো!

হ্যাঁ—ঠিক মাঝখানে ঝাঁকড়া ডালপালা ও পাতার মধ্যে একটা কাকের বাসা রয়েছে। সেখানে বসে ডিমে তা দিচ্ছে একটা কাক। কর্ণেল একটু হেসে বললেন—এবার ঐ শিমূল গাছটার দিকে তাকাও। ওই গ্যাখো একটা কোকিল কেমন খাপটি পেতে বসে রয়েছে। কদিন আগে দেখলাম, ওই কোকিল আর তার সঙ্গীটা কোত্থেকে এসে শিমূলডালে বসল। সঙ্গীটা পুরুষ কোকিল। সে করল কী, আচমকা এসে কাকটাকে জ্বালাতন শুরু করল। কাকটা অগত্যা ডিম ছেড়ে ওকে তাড়া করল। উদ্দেশ্যটা তখনও বুঝিনি। প্রায় সকাল থেকে দুপুর

অব্দি ওই ভাবে ওকে ক্রমাগত জ্বালাতন করছিল কোকিলটা। অবশেষে দেখি কাকটা এবার ওকে তাড়িয়ে দূরে নিয়ে গেল। সেইসঙ্গে আরও অনেক কাক যোগ দিল দলে। ওরা ওই দূরের বাড়িটার দিকে চলে গেল। স্ত্রীকোকিলটা অমনি এসে কাকের বাসায় বসে পড়ল—ডিমগুলোর ওপর। ঠুকরে ফেলে দেবার চেষ্টাও করল। একটা পড়ে গেল। কিছুক্ষণ পরেই সে উড়ে পালাল। ডিমগুলো এখান থেকে গোনা যায় না। যাই হোক, কোকিলটা যে কাকের বাসায় ডিম পেড়ে গেল, তাতে কোন ভুল নেই।

—কাকটা ফিরল না আর?

—অনেক পরে ফিরে এল চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে। আবার তা দিতে থাকল। ওই ছাখ, কেমন চুপচাপ বসে প্রকৃতির নিয়ম পালন করছে। এরপর একদা আমরা কাকের বাচ্চার দলে দুটি-একটি কোকিলবাচ্চা নিশ্চয় দেখব। ভারি অদ্ভুত ব্যাপার চলে প্রকৃতিজগতে!

—কোকিল যে বাসা বানাতে জানে না। ওরা ছন্নছাড়া হাঘরে পাখি! শুধু গানটান আমোদ স্ফূর্তি করেই জীবন কাটাতে চায়।...বলে আমি হেসে উঠলাম।

—রাইট, রাইট। গানটান আমোদস্ফূর্তি! ঠিকই বলেছ, জয়ন্ত। কিন্নরজাত।

কর্নেল কিন্তু হাসলেন না। গম্ভীর হয়েই বললেন কথাটা! তারপর আমার হাত ধরে বেরোলেন। মিসেস এ্যারাথুনকে বিদায় সম্ভাষণ করে আসতে ভুললেন না।

গাড়ি ষ্টার্ট দিলাম। পার্ক স্ট্রীটে ঢোকার পর কর্নেল মুখ খুললেন—ইয়ে জয়ন্ত, আমরা আপাতত টালিগঞ্জে যাচ্ছি।

—কেন? বিলাসপুর কী হল?

—আগে টালিগঞ্জে যাই তো! এ্যাটর্নী মজুমদারের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

মিঃ সুশান্ত মজুমদারের বাড়িটি অত্যাধুনিক ধাঁচের। বাগবাগিচা, সবুজ লন, টেনিসকোর্ট রয়েছে। কিন্তু বাড়িটা ছোট। একতালা। নানারঙের স্ট্রিমলাইন দেয়ালে থাকায় মনে হয় ভীষণ গতিশীল।

সুশান্তবাবু বিপত্নীক মানুষ। হাসিখুসি সৌমকান্তি। মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। কিন্তু ব্যক্তিত্ব আছে চালচলনে—বিশেষ করে ঠোঁটের কোনা আর চিবুকে দৃঢ়সংকল্প মানুষের পরিচয় রয়েছে। আমাদের পরিচয় পেয়ে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেলেন বসার ঘরে। বললেন—আজ একটু সাকাল-সকাল অফিসে যাব ভেবেছিলাম। যাকৃগে, সেজন্যে আমার অনারেবল গেষ্টদের উদ্বেগের কারণ নেই। অন্তত আধঘণ্টা সময় যথেষ্ট হবে, আশাকরি।

বুঝলাম, ভদ্রলোক খুব নিয়মনিষ্ঠ এবং কেজো মানুষ। সময়ের অপব্যবহার করেন না মোটেও।

কর্ণেল বললেন—আপনার কর্ম তো চার্চলেনে, মিঃ মজুমদার?

—হ্যাঁ। বোস এ্যাণ্ড মজুমদার। পৈতৃক বলতে পারেন।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। আপনার বাবা মিঃ রথীন্দ্র মজুমদারের খ্যাতির কথা আজও কেউ ভোলেনি। কলকাতার সবচেয়ে বিজ্ঞ সলিসিটার বলতে……

সুশান্তবাবু হেসে বললেন—সে দিন চলে গেছে, কর্ণেল সরকার। বাই দা বাই, আপনি শুনলাম মিসেস সেনের পক্ষে মিঃ সেনের রেজিষ্টার্ড উইলটা চ্যালেঞ্জ করতে চান। দেখুন কর্ণেল সরকার, আমরা—মানে মেসার্স বোস এ্যাণ্ড মজুমদার দীর্ঘ একুশবছর ধরে মিঃ সেনের উন্নতির গোড়া থেকেই ওঁর কাজকর্ম করে আসছি। মিঃ বোস অবশ্য নেপথ্যে থাকেন বরাবর—আমি মিঃ সেনের আইন সংক্রান্ত উপদেষ্টা। এ্যাটর্নি জেনারেলের অফিসে যে উইল সম্পাদিত এবং যথারীতি রেজিস্ট্রি করা হয়েছে—তা ওল্টানো শুধু অসম্ভব নয়, অবাস্তব এবং হাস্যকর চেষ্টা। দেয়ার আর সাম ল'জ ইন আওয়ার কানট্রি।

কর্ণেল হাত তুলে বললেন—যথেষ্ট, যথেষ্ট মিঃ মজুমদার! আমি একজন নগণ্য প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটার মাত্র। শুধু কিছু জিজ্ঞাস্য নিয়ে এসেছি। জবাব পেলেই খুসি।

—বেশ, বলুন কী জানতে চান?

—মিঃ সেনের উইলের তারিখটা জানতে চাই।

—একুশে ফেব্রুয়ারী—দিস ইয়ার।

—মিঃ মজুমদার, ইতিমধ্যে হিতেনবাবু আপনাকে এই উইল পরিবর্তন করে কোন নতুন উইলের কথা কি বলেননি?

—এ্যাবসার্ড! হাউ ডু ইউ ইমাজিন ছাট? কেন ভাবছেন ও কথা?

কর্ণেল না দমে বললেন—এ কি সত্য যে দোলপূর্ণিমার পিকনিকের অনুষ্ঠানে হিতেনবাবু তাঁর নতুন উইলের কথা ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন?

সুশান্তবাবুর মুখ রাঙা হয়ে গেল। চোখদুটো তীব্রতর হল। বললেন—ননসেন্স! এমন প্রশ্ন আজগুবি শুধু নয়, আমার সুনাম —আমার ফার্মের সুনামের পক্ষে ক্ষতিকর।

কর্ণেল গ্রাহ্য করলেন না। বললেন—সেই নতুন উইল যথারীতি সম্পাদন করা হয়েছিল, হিতেনবাবু সইও করেছিলেন এবং পরদিন রেজিষ্ট্রি করা হত কলকাতা ফিরেই। আপনি কী বলেন?

সুশান্তবাবুর মুখটায় যেন আগুন জ্বলছে। কিন্তু কিছু বললেন না।

—এই নতুন উইলের সাক্ষী হিসাবে সই করেছিলেন ওঁর শ্যালক ডাক্তার অমরেশ গুপ্ত, সোফার সুরেন্দ্র ঘটক এবং হিতেনবাবুর পারিবারিক চিকিৎসক ডাক্তার সত্যেন সিংহ রায় এবং আপনি। কী বলেন মিঃ মজুমদার?

সুশান্তবাবু হো হো করে আচমকা হেসে উঠলেন।—মাথা খারাপ! মাথা খারাপ!

—এই নতুন উইলে মিস শ্যামলীকে মাত্র নগদ দশহাজার টাকা, স্ত্রী স্বাগতা সেনের নামে মোট সম্পত্তির অর্ধেক, এবং কয়েকজন

দুঃস্থ আত্মীয়স্বজনের নামে···

সুশান্তবাবু পলকে মুখ বিকৃত করে বললেন--আমার সময়ের দাম আছে মশাই। লেট ইট বি ফিনিশড হেয়ার।

উনি উঠে দাঁড়ালেন। কর্ণেলের ওঠার চেষ্টা দেখলাম না। আমরা ব্যাপারটা খুব অপমানজনক মনে হচ্ছিল। কর্ণেলের দিকে তাকালাম। কর্ণেলের দৃষ্টি সুশান্তবাবুর মুখের দিকে। বললেন—গতকাল সকাল দশটা নাগাদ আপনি মিঃ সেনের নিউআলিপুরের বাড়ি গিয়েছিলেন। তখন আমরা মিসেস সেনের সঙ্গে ওপরের ঘরে কথা বলছিলাম। কেন গিয়েছিলেন সুশান্তবাবু? কার কাছে?

—কে বলেছে আপনাকে?

—জগন্নাথ। আমি ও মিসেস সেন কথা বলছিলাম, জয়ন্ত উঠে বাইরে গেল—তারপর জগন্নাথ মিসেস সেনকে গিয়ে বলল, আপনাকে নিচের লাইব্রেরী ঘরে বসে থাকতে দেখেছে। তাই একটু পরেই আমি ও শ্রীমতী সেন নিচে লাইব্রেরীতে গেলাম। গিয়ে আবিষ্কার করলাম শ্যামলীকে। ইতিমধ্যে আপনি সম্ভবত বাড়ির পেছনে ঘুরে চলে গেছেন। সামনে দিয়ে বেরোলে জয়ন্ত দেখতে পেত।

—গেট আউট! গেট আউট ইউ ওল্ড ফুল! গর্জন করে উঠলেন সুশান্তবাবু! থরথর করে রাগে কাঁপছেন ভদ্রলোক।

এবার কর্ণেল উঠে দাঁড়ালেন। পা বাড়াতে গিয়ে ঘুরে বললেন—ফিল্ম অভিনেতা পার্থকুমার ২১শে ফেব্রুয়ারী উইল রেজিস্ট্রির পরদিন ২২শে তারিখে শ্যামলীকে বিয়ে করবে বলে হোটেলে পার্টি হয়। হোটেলের এই পার্টির সব খরচ আপনার নামে বিল করা হয়েছিল। তার মানে--আপনিই এর উদ্যোক্তা ছিলেন। মিঃ মজুমদার, পার্থ আপনার কে?

—গেট আউট, কোন কথার জবাব আমি দেব না।

—ক্যাবারে গার্ল মিস শ্যামলীকে হিতেনবাবুর প্রথম স্ত্রীর হারিয়ে যাওয়া মেয়ে বলে আপনি হিতেনবাবুকে কনভিনসড করেছিলেন:

দিনের পর দিন সুপরিকল্পিত পথে ওঁর বিশ্বাস আপনি এনেছিলেন শ্যামলীর প্রতি। এমন কি হিতেনবাবুর পোর্ট্রেট আঁকিয়ে শ্যামলীর ঘরে রাখতে বলেছিলেন এবং শ্যামলী নামে হতভাগিনী পিতৃমাতৃ পরিচয়হীনা ক্যাবারে গার্লটিকে যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। সে তার টের পায়নি। কিন্তু সুটিঙে গিয়ে পিকনিকের পরদিন সে ফুলটা কুড়িয়ে পেল, পরিচালক অতীন্দ্রবাবুর কাছ থেকে পার্থকুমার তা জানল এবং আপনাকে জানাল। অমনি আপনি শ্যামলী সম্পর্কে সতর্ক হয়ে উঠলেন। বিশেষ করে শ্যামলী যখন আপনার ব্রাউন রঙের কোটের বাটনহোলে একই প্রিন্স অ্যালবার্ট গোলাপ দেখে মারাত্মক প্রশ্ন করে বসল—হোয়াট ওয়াজ ইন দা ইভনিং অফ টোয়েনটি ফিফথ—শ্যামলী তারপরই আমার কাছে যায়—মিঃ মজুমদার, আপনি দেখলেন শ্যামলী আপনাকে চিনে ফেলেছে। এবং সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার—সে পার্থকে ফোনে জানিয়ে দিল যে এ বিয়ে হবে না। শ্যামলী ক্যাবারে গার্ল হলেও সে অর্থলোভী হৃদয়হীনা ছিল না। আমি তাই তাকে বারবার কোমলহৃদয়া বলেছি। মিসেস সেনের বাড়িতে আপনি আমার নামে ফোন করে ডেকে পাঠান ওকে। শ্যামলী তক্ষুনি চলে যায়। কেন যায় শ্যামলী? শুধু আমি ডাকছি বলে নয়—সে মিসেস সেনকে তাঁর ন্যায্য সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে চায় না, উইলে যাই থাক্—একথা বলতেই যায়। শ্যামলী ছিল ভীষণ ভাবপ্রবণ মেয়ে। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য, গিয়ে আপনার ফাঁদে পড়ে যায়। আপনি মিসেস সেনের ছদ্মবেশে লাইব্রেরীতে অপেক্ষা করছিলেন ওঁর জন্যে।

—মিথ্যা! সব জঘন্য মিথ্যা! আমি একজন লইয়ার! আমি আপনার বিরুদ্ধে মামলা করব!

—পর্দার আড়াল থেকে ডাক্তার অমরেশ আপনাকে খুন করার পর পালাতে দেখেছেন, সুশান্তবাবু। আপনি গরাদবিহীন ফ্রেঞ্চ জানলা গলিয়ে চলে গেলেন। আপনার হাতে কালো শাড়িটা ছিল। আপনি বাথরুম থেকে পোষাক বদলেই লাইব্রেরীতে ঢোকেন। কিন্তু

আপনার দুর্ভাগ্য, তাড়াতাড়িতে আপনার ব্রাউন কোটটা পরার সময় পাননি। আলমারির পিছনে ফেলে রেখে ছিলেন। পরে—মানে, এখনই বেরোতে চাচ্ছিলেন কোটটা এক সুযোগে নিয়ে আসতে। কারণ গতকাল পুলিশ ছিল বাড়িটাতে—আজ নেই। এবং আজই ভোরে ঝাড়ু দিতে গিয়ে জগন্নাথ কোটটা আবিষ্কার করেছে। সুশান্তবাবু, বিলাসপুরে মিঃ সেনের ডেডবডির কাছে পড়ে থাকা ফুলে আপনার কোটের একটা ফাইবার জড়িয়ে রয়েছে—ওটা চুল নয়. আঁশ।

সুশান্তবাবুর মুখ সাদা হয়ে যাচ্ছিল ক্রমশ। দুহাতে একটা চেয়ারের পিছনদিক ধরে ঝুঁকে পড়েছিলেন। হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন—কিন্তু—বাট ইউ আর রং। পিকনিকের দিন সন্ধ্যায় আমি মিসেস সেনের আর অমরেশ ডাক্তারের সঙ্গে সারাক্ষণ গল্প করেছি।

—মোটেও না স্যার। ওঁদের কাছে ছিলেন যিনি—তিনি ফিল্ম অভিনেতা পার্থকুমার। সে সবার শেষে জুটেছিল একা—তখন আপনি মিঃ সেনের সঙ্গে বাড়ির মধ্যে মোকাবিলা করছেন। আপনার নাম মিসেস সেন জানতেন—সোফার চাকর রাঁধুনীরা সবাই জানত—অমরেশও এসে শুনেছিল, কিন্তু কারো সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় আপনার হয়নি। আপনি হিতেনবাবুর বাড়ি কখনও যাননি। কাজ যা কিছু হয়েছে—সব অফিস থেকেই। কাজেই সবার শেষে এমন সময় পার্থকুমার বটতলায় তাঁবুর কাছে হাজির হয়ে নিজের পরিচয় দিল—যখন মিঃ সেন কুঠিবাড়িতে কী কাজে রয়েছেন। তারপর—

সুশান্তবাবু এবার দৌড়ে আলমারির কাছে গেলেন। চাবি বের করে গর্তে ঢুকিয়েছেন—কর্নেল আচমকা রিভলবার বের করে বললে —ও চেষ্টা করবেন না মিঃ মজুমদার!

পরক্ষণ হুড়মুড় করে বাইরে থেকে তিনজন পুলিশ অফিসার এসে ঢুকে পড়লেন। সবাই সশস্ত্র। চারটে রিভলবারের সামনে সুশান্তবাবু কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছেন।……

কর্ণেলের বাসায় আমি, চন্দ্রানী আর লালবাজার ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্টের এক অফিসার—আমার নামেই—নাম জয়ন্তবাবু, আড্ডা দিচ্ছিলাম সেদিন রাত নটায়।

কর্ণেল কেসটা বর্ণনা করছিলেন।

—হিতেন সেনের স্ত্রীর মৃত্যুর অনেকবছর পরে ঘটনাচক্রে এয়ারহোস্টেস স্বাগতার সঙ্গে পরিচয় এবং প্রেম হয়। বিয়ের সিদ্ধান্তে আসতে বহুদিন লেগে যায়। এদিকে হিতেনবাবুর একমাত্র মেয়ে তিনবছর বয়সে হারিয়ে গিয়েছিল। আর ছেলেপুলে হয়নি প্রথমা স্ত্রীর। অনেক চেষ্টাতেও হারানো মেয়ের সন্ধান পাননি। যাই হোক, স্বাগতার প্রসঙ্গে আসি এবার। স্বাগতার সঙ্গে বিয়ে রেজেস্ট্রি অবশেষে হল। গত সেপ্টেম্বর মাসের দশ তারিখে—বোম্বেতে। হিতেনবাবু একা কলকাতা ফিরলেন। স্বাগতার চাকরীর ব্যাপারে তক্ষুনি ছেড়ে দেওয়ার কিছু বাধা ছিল। ইতিমধ্যে হঠাৎ বিমান দুর্ঘটনায় স্বাগতার মুখের একটা দিক পুড়ে বিকৃত হয়ে যায়। হৃদয়বান মানুষ হিতেন সেন বোম্বে গিয়ে অনেক খরচা করেও প্ল্যাস্টিক সার্জারিতে কাজ হল না। এ্যালার্জি শুরু হল। অগত্যা ফের অপারেশান করে বিকৃত মুখ নিয়েই দাম্পত্যজীবন যাপনের উদ্দেশ্যে স্বাগতাকে চলে আসতে হল গত নভেম্বরে—স্বামীর সঙ্গে। মুখটা সবসময় ঢেকে রাখতে অভ্যাস করলেন ভদ্রমহিলা।

কর্ণেল একটু চুপ করে থাকার পর ফের বলতে শুরু করলেন—অত খুঁটি-নাটি না বললেও চলবে। সবটা তো তোমরা অনুমান করতে পারছ। মুখ পোড়ার পর থেকে স্বাগতার একটা গুরুতর মানসিক প্রতিক্রিয়াজনিত ভাব প্রকাশ হতে থাকে। সে দজ্জাল হয়ে ওঠে। কথায় কথায় স্বামীকে লাঞ্ছিত করে। হিতেনবাবু ক্রমশ তার ব্যবহারে চটে গেলেন। বিচ্ছেদ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল গত ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি। ইতিমধ্যে সুশান্ত মজুমদার বোকা সরল মেয়ে শ্যামলীকে হাত করে টোপ ফেলে আসছিলেন। ২১ তারিখে উইল রেজেস্ট্রি হল। স্ত্রীকে যখন ডিভোর্সই করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন

—তখন বেশি কী আর দেবেন হিতেনবাবু! নেহাৎ হৃদয়বান মানুষ বলে কিছু দিলেন উইলে। এ মাসের অর্থাৎ মার্চের মাঝামাঝি যে ভাবে হোক—আমি জানি না, জানতেও আর পারব না—হিতেনবাবু সুশান্ত মজুমদারের চক্রান্ত টের পেয়ে যান। হয়তো শ্যামলীই বেফাঁস কিছু বলে থাকবে—যাতে সুশান্তবাবুর সঙ্গে তার গোপন যোগাযোগ ইত্যাদি প্রকাশ হয়ে পড়ে হিতেনবাবুর কাছে। কিন্তু নতুন উইলে শ্যামলীকে বঞ্চনা করতে চাননি। কারণ হারানো মেয়ের জন্য স্নেহ ততদিনে শ্যামলীতে কিছু ঘন হয়ে উঠেছিল অভ্যাসের ফলে। যাই হোক, তিনি ঠিক করলেন পিকনিকের দিন শ্যামলীও উপস্থিত থাকবে এবং নতুন উইল পড়ে শোনানো হবে।

আমি এসময় বলে উঠলাম—কর্ণেল, ২১ ফেব্রুয়ারী উইল রেজেস্ট্রির পর দিনই শ্যামলীর সঙ্গে পার্থের বিয়ের পার্টি হয়েছিল। তা হলে দেখছি—

—রাইট। পার্থ হচ্ছে সুশান্ত মজুমদারেরই ছেলে। বাবার সঙ্গে থাকে না। একটু উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতিরও বটে। কিন্তু তা হলেও ছেলে তো বটে! সুশান্তবাবু ওকে বলেছিলেন—শ্যামলী সম্পত্তি পাচ্ছে—তার সঙ্গে প্রেম ও বিয়ে পার্থর পক্ষে মঙ্গল। নিজেই ছবি করতে পারবে। পার্থ রাজী হয়--সিনেমাই তার জীবন। এবার আমার বিলাসপুরের কুঠিবাড়িতে যাই। মিসেস সেন, মিঃ সেন ও অমরেশ এক গাড়িতে, অন্য গাড়িতে জিনিসপত্র, জগন্নাথ, হরিয়া, ঘনশ্যাম এবং ড্রাইভার সুরেন্দ্র। মিঃ মজুমদার এলেন সবার শেষে। কিন্তু তিনি তাবুর কাছে গেলেন না। দূর থেকে ইসারায় মিঃ সেনকে ডাকলেন। জগন্নাথ দেখেছিল এটা। মিঃ সেন চলে গেলেন ওঁর কাছে। তাঁবুর কাছে মিসেস সেন আর অমরেশ এবং সুরেন্দ্ররা থাকল। মিঃ সেন ও মজুমদার ঢুকলেন কুঠিবাড়ীতে। একটু পরেই পার্থ বাবার মতো ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি পরে চলে এল তাঁবুর কাছে—সে এতক্ষণ সুযোগের অপেক্ষা করছিল কুঠিবাড়ির পিছনে—সম্ভবত গাছপালার আড়ালে। সে নিজের পরিচয় দিল মিঃ সুশান্ত মজুমদার বলে। গল্পে গল্পে

জমিয়ে তুলল। ওদিকে কুঠিবাড়ির ঘরে নাটক চলছে তখন। নাটকটা ঠিক কী কম—বলা কঠিন। তবে লেটেস্ট তদন্ত থেকে আমার ধারণাই প্রমাণিত হয়। সুশান্তবাবু মিঃ সেনকে আচমকা রিভলবার বের করে গুলি করতে যাচ্ছিলেন—কিংবা অন্য কোন ভাবে আক্রমণ করেছিলেন, মিঃ সেন আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হন তখনকার মতো। ওঁর রাইফেলটা ঘরেই কথাও রেখেছিলেন—বের করে আনতে আনতে নিশ্চয় সুশান্তবাবু তখন ভোঁ দৌড়। নদীর ধারে ভাঙা পাঁচিল ডিঙিয়েই পালালেন। মিঃ সেন রাইফেল হাতে বেরোলেন। ঠিক সেইসময় কাকগুলো তাড়া খেয়ে উড়ে যাচ্ছে। ধূর্ত পার্থ সুযোগটা নিল। জগন্নাথ বলেছে—সে ওই সময় বলে ওঠে, 'কী কাণ্ড! মিঃ সেন কাকের ওপর রেগে গেলেন দেখছি! কাক মারতে দৌড়চ্ছেন! সবাই এই বাক্যে ধারণা দাঁড় করায়—হ্যাঁ, মিঃ সেন কাক তাড়া করে যাচ্ছেন। পার্থ নিশ্চয় উদ্বিগ্ন হয়েছিল। যাই হোক, ওদিকে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছেন প্রাণভয়ে ভীত সুশান্তবাবু। আর সেই ঝোপের সামনে দাঁড়িয়ে বুলেট ভরা রাইফেল হাতে এদিক ওদিক তাঁকে খুঁজছেন হিতেন সেন। সুশান্তবাবুর নার্ভ শক্ত। সুযোগটা নিলেন। আচমকা বাঘের মতো লাফিয়ে পড়লেন। ধস্তাধস্তি হল। তারপর যেভাবেই হোক গুলি বিঁধল মিঃ সেনের ডানদিকে গলায়—কণ্ঠতালু ভেদ করে বুলেট মগজে বিঁধে হাড়ে আটকে গেল। ওখানে সবাই ভাবলেন—মিঃ সেন কাককে গুলি করলেন। অনেক পরে উদ্বিগ্ন পার্থ সুরেন্দ্রকে নিয়ে খুঁজতে বেরোল। সে আশা করেছিল—বাবার মৃতদেহ দেখবে। কিন্তু দেখল হিতেন সেনের মৃতদেহ।...

কর্নেল চুরুট ধরালেন। মিসেস এ্যারাথুন ট্রেতে চা নিয়ে এ., আরেক দফা। আমরা চায়ের কাপ তুলে নিলাম।

চন্দ্রানী বলল—ওই ফুলটাই অবশ্য শ্যামলী আর সুশান্ত মজুমদারের কাল হল।

ডিটেকটিভ অফিসার জয়ন্তবাবু বললেন—জানেন? আগাগোড়া

ব্যাপারটায় একমাত্র আমারই কিন্তু সন্দেহ থেকে যাচ্ছিল।

র্লি বললেন—হ্যাঁ। কাকচরিত্র নামে প্রাচীন শাস্ত্র পড়েছি যদি ডাকতে ডাকতে কারো মাথার উপর দিয়ে বায়ুকোণ িকোণে যায়, তাহলে তার মৃত্যু অনিবার্য। মিঃ সেনের র ঠিক ওই দিকেই কাকগুলো যাচ্ছিল।

লাম—তাহলেও কাক সবচেয়ে বোকা পাখি। কোকিলের জের ভেবে লালনপালন করে। অথচ কোকিল ইজ

হসে বললেন—তুমি শ্যামলীর কথা বলছ! দ্যাটস রাইট, িসিডেণ্ট ইজ অ্যাকসিডেণ্ট, উইল ইজ উইল—এবং কিল ইজ কোকিল। ঘরবাঁধা তার ভাগ্যে লেখেননি বেচারা শ্যামলী!...

কয়েকটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল।